শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

২০০৮ এ ও কানাডায় বিয়ের বৈধ বয়স ছিল ১৪ থেকে ১৮। ২০০৮-তে তারা একটি ভয়ানক অপরাধ আইন পাশ করে বিয়ের বয়স পরিবর্তন করে ফেলে। এখন আমাদের এমনিতেই প্রশ্ন আসতে পারে, এতো শত শত বছর কেন চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারত এবং সে সাবালিকা ও ম্যাচুরড হিসেবে গণ্য হত, হঠাৎ ২০০৮ তে তাদের কী হলো? কেন তারা বিয়ের বয়স সংশোধন করলো? উত্তর হলো, এসবের কারণ হচ্ছে স্ববিরোধী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। আমাদের আইনই কেবল সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন মেয়ে যদি সাবালিকা হয়, তখনই কেবল সে বিয়ে করতে পারে যদি সে চায়। আল্লাহর কসম করে বলছি, তাদের আইনের কোন ভিত্তি নেই। আমাদের এমন কিছু নেই যে যার জন্য আমাদের লজ্জা করতে হবে। আল্লাহর কসম, যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সকল মানুষ একযোগে একসাথে রাসূলের কাজ ও কর্মে সমর্থিত কোন কাজের বিপরীতে অবস্থান নেয়, আমি তখনও বলব, তিনিই সঠিক অবস্থানে আছেন, আর বিশ্বের তাবৎ মানুষ ভুলের মধ্যে আছে।

আয়েশার বিয়ে ও বাল্যবিবাহ

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

লেখক | শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

অনুবাদ | রওনক আহমেদ

সম্পাদনা | উদ্দীপন টিম

আয়েশার বিয়ে ও বাল্যবিবাহ

শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল

প্রথম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪১/সেপ্টেম্বর ২০১৯

বাংলাবাজার পরিবেশক
আর-রিহাব পাবলিকেশন
মাকতাবাতুন নুর

অনলাইন পরিবেশক

Ruhama Shop
Rokomari.com
wafilife.com
amaderboi.com
sijdah.com
ghazalibookshop
Boigriho.com
pothikshop.com

মুদ্রিত মূল্য: ১৫০ টাকা

দোকান নং: ১২৫ ৩৮/৩ নিচতলা
কম্পিউটার কমপ্লেক্স বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৪৪-১১১৭২
uddiponprokashon@gmail.com
fb.com/uddiponprokashon

ভূমিকা

শাইখ আহমদ মুসা জিবরিল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নির্ভীকতা এবং স্পষ্টভাষিতায় সমসাময়িক আলেম ও স্কলারদের মধ্যে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ একেবারেই বিরল। তিনি যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করেন বা বক্তব্য প্রদান করেন স্বাভাবিকভাবেই, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এবং শক্তিমত্তার সঙ্গেই তার সেই বক্তব্যে ও আলোচনায় জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নির্ভীকতা এবং স্পষ্টভাষিতার একত্র উচ্ছ্বাস ও সিম্ফনির উজ্জ্বল অভিপ্রকাশ ঘটে।

যুক্তরাষ্ট্রে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁর পিতা শাইখ মুসা জিবরিল রাহিমাহুল্লাহ, যিনি মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর শৈশবের বেশ কিছু সময় কাটে মদিনায়। এগারো বছর বয়সে তিনি হিফয সম্পন্ন করেন। নিম্ন মাধ্যমিক শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি বুখারী ও মুসলিম শরিফ মুখস্ত সম্পন্ন করেন। তাঁর কৈশোরের বাকি সময়টুকু যুক্তরাষ্ট্রেই কাটে। পরবর্তীতে তিনিও তার বাবার মতো মদিনার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরীয়াহর উপর ডিগ্রী লাভ করেন।

আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীনের তত্ত্বাবধানে অধ্যায়ন করেন এবং তার কাছ থেকে তাযকিয়্যাহ লাভ করেন। শাইখ বাকর আবু যাইদের কাছে একান্ত দরসে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহহাব ও শাইখ আল-ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যার কিছু গ্রন্থ অধ্যায়ন করেন। তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার আশ-শিনক্বিতীর অধীনে চার বছর পড়াশুনা করেন। আল্লামা হামদ বিন উকালা আশ-শুয়াইবির অধীনেও তিনি অধ্যায়ন করেন এবং তাযকিয়্যাহ লাভ করেন।
শাইখ মুসা জিবরিল ও শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায আমেরিকায় অবস্থানরত সৌদি ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ আহমাদ মুসা জিবরিল শাইখ বিন বাযের কাছ থেকে তাযকিয়্যাহ অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করার সময় শাইখ বিন বায তাকে "শাইখ" হিসেবে সম্বোধন করেন এবং তিনি আরো বলেন, তিনি "আলিমদের কাছে সুপরিচিত" ও "উত্তম আক্বিদা পোষণকারী।"

অনুবাদকের কথা

বিশ ও একুশ শতকে মানবপ্রকৃতি ও স্বভাববিরুদ্ধ যত উদ্ভট ও অযৌক্তিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার মধ্যে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ ও বিয়ের বয়স নির্ধারণ অন্যতম। মানবসভ্যতার সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত সময়ে বিয়ে সম্পাদিত হওয়ার বিকল্প নেই। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে পাশ্চাত্যের কিছু দেশে এবং শেষের দিকে প্রাচ্যের দেশগুলোতে ব্যাপক অপপ্রচার ও অমূলক জনসচেতনতার মাধ্যমে মানুষের বৈধ ও মৌলিক যৌন অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। মানবসৃষ্ট এই ভিত্তিহীন আইনকানুনের ফলে ক্রমশ মানুষের বৈধ ও স্বাভাবিক যৌন জীবনের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসছে, পক্ষান্তরে বিবাহোত্তর অবৈধ ও অসংযত যৌনাচারের পরিধি অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হচ্ছে।

উম্মুল মুমিনিন আয়েশার রা.-এর সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ের আলোচনা সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই বিয়ের বয়স ও বাল্যবিবাহের মাসআলা চলে আসে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও বাল্যবিবাহ নিয়ে বর্তমানে এমন এমন ভুল চিন্তা ও ধারণা পরিলক্ষিত হয় যা আমাদের ঈমানধ্বংসের কারণ হতে পারে।

এ বিষয়ের উপর দুই মলাটের মধ্যে প্রাজ্ঞ আলিমদের রচনা থেকে কয়েকটি রচনা একত্রিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদ সংকলনটিতে অভিন্ন বিষয়ের উপর কাছাকাছি ও প্রাসঙ্গিক তিনটি লিখিত বক্তব্য রয়েছে, লেখা তিনটির প্রথমটি শাইখ আহমদ মুসা জিবরিলের We Are Proud of Our Prophet's Marriage to Aishah ইংরেজি বক্তৃতার অনুবাদ, দ্বিতীয়টি موسوعة البيان আরবি জ্ঞানকোষের রাসুলে কারিম সা.-এর খন্ডের আয়েশার সঙ্গে রাসূলের বিয়ে প্রশ্নের উত্তরের অনুবাদ, আর সর্বশেষটি আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. এর বিখ্যাত উর্দু গ্রন্থ ہماری عائلی مسائل কিতাবটির শেষ প্রবন্ধের সামান্য কিছু অংশের অনুবাদ।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা সঠিক পথ ও মতের উপর অবিচল রাখুন।

সূচিপত্র

আয়েশার বিয়ে আমাদের অহংকার :

[[1]শাইখ মুসা জিবরিলকে উদ্দেশ্য করে একজন শ্রোতা প্রশ্ন করলে তিনি বিশদভাবে তার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।]

অনেকে বলে থাকে, সহিহ বুখারির যে হাদিসটিতে বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং নয় বছর বয়সে তিনি নবিজির ঘরে যান সে হাদিসটি সহিহ না। এ নিয়ে এখন তুমুল বিতর্ক চলছে, আপনার কাছে এ বিষয়ের উপর একটু আলোকপাত করার অনুরোধ রইল।

تزوجت وهى بنت سبع سنين وزفت ا

আপনি যে হাদিস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সেটি সহিহ বুখারিতে আছে, এই হাদিসটি সহিহ বুখারির মধ্যকার অন্য সমস্ত হাদিসের মতই একই পর্যায়ের সহিহ ও প্রামাণিক। আমি নিশ্চিত নই, যারা এই হাদিসকে সহিহ মনে করে না তাদের `অনেকে, বলে আপনি কাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন।

তবে পূর্বঅধ্যয়ন ও গবেষণার উপর ভিত্তি করে আমি বলতে পারি হাতে-গণা কয়েকজন মুসলিম মর্ডানিস্ট এসব বলে থাকে, যাদেরকে দেখা যায়, কয়েকটি বইপত্র ঘেটেই হাদিসের মান নির্ধারণ ও শ্রেণীবিভাজনের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারি রহ.-এর সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য মাঠে নেমে পড়ে, এছাড়াও এদের আরেকটি লক্ষ্মণ হলো, এদের মধ্যে দ্বীনের অনেক ক্ষেত্রেই এক প্রকারের পরাজয়মূলক ও বশ্যতা সুলভ মনোভাব লক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়।

জ্ঞানের যে কোন শাখায় যখন কেউ যদি সে বিষয়ের জ্ঞান লাভ না করেই এবং পড়াশোনা ছাড়াই আলোচনা জুড়ে দেয়, আর অন্যদিকে যদি তার শ্রোতারাও সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকে, তখন সে তাদেরকে কথার যাদু দিয়ে মন্ত্রগ্রস্ত করে ফেলে। আমি যদি আপনাদের সামনে কম্পিউটার সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করি, আমি যদি বলি "এই যে দেখ, এটা হলো একটি কম্পিউটার, আর সেটি হলো আরেকটি কম্পিউটার, এসব যা দেখছ সবগুলোই কম্পিউটার। প্রতিটি কম্পিউটারে একটি মনিটর থাকে, একটি

---

১ শায়েখ মুসা জিবরিল হাফিজাহুল্লাহ-এর We Are Proud of Our Prophet's Marriage to Aishah বক্তৃতার সরল অনুবাদ।

কিবোর্ড থাকে এবং এটি ওয়াই-ফাইয়ের সাথে সংযুক্ত থাকে।„ আমি এসব বলে সহজেই আপনাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পারব, কারণ আপনারা কম্পিউটার সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। তবে এখানে যদি কোন কম্পিউটার স্পেশালিষ্ট বা ইঞ্জিনিয়ার থেকে থাকেন, তাহলে এসব বেসিক ক-খ-গ-ঘ, এবং জায়গা বিশেষ অবান্তর কথাবার্তা শুনে তিনি অট্টাহাসি জুড়ে দিতে পারেন।

ইসলামের জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান ব্যক্তিরা আজকাল ইসলাম নিয়ে অজ্ঞ ও অর্বাচিন লোকদের কথাবার্তা এবং উল্লিখিত প্রশ্নের মত বিশদ আলোচনার দাবি রাখে এমন জটিল বিষয়ে তাদের আলোচনাকে সাধারণত যেভাবে একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার একজন সাধারণ মানুষের বেফাঁস কথাবার্তার মূল্যায়ন করে থাকেন সেভাবেই মূল্যায়ন করে থাকেন। আমার বুঝে আসে না, তারা এ ধরনের কাজ করার স্পর্ধা কীভাবে দেখায়, আমার বিবেচনায় এটা কেবল তাদের একারই দোষ নয়, বরং আমজনতারও এখানে দোষ আছে।

আমরা আজকাল সাধারণ মানুষদের মধ্যে অনেককেই বলতে শুনি ওয়াল্লহি! তার প্রচুর এলম আছে, অথচ বাস্তবতা হলো, যার কথা বলা হচ্ছে সে দুটি আরবি শব্দও ঠিকমত জানে না। তাহলে সে কীভাবে প্রচুর এলমের অধিকারী হতে পারে! তুমি আরবি ভাষা মোটেই জানো না, অথচ তুমি একজনকে বলে বেড়াচ্ছ সে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী। যদি এসমস্ত লোকেরা যাদেরকে মানুষ মহাজ্ঞানী ভাবে, তারা যদি আলিমদের সামনে সহিহ বুখারির কিছু হাদিসে সমস্যা আছে এ ধরনের উদ্ভট ও আজগুবি কথা তুলে, তখন তারা তাদের কথা শুনে যারপরনাই হাসতেই থাকবেন।

যারা উক্ত হাদিস নিয়ে কথা বলেছেন, তাদের একজনকে আমি শনাক্ত করতে পারব, তিনি হচ্ছেন, আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, যিনি এ হাদিসকে যয়িফ গণ্য করেছেন। বলে রাখি, হাদিস তার গবেষণার বিষয় ছিল না। তবে তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু ভাল কাজ রেখে গেছেন, তবে হাদিসশাস্ত্রের উপর তিনি কোন কাজ রেখে যান নি। কিছু কলামিস্ট আব্বাস আল আক্কাদকে অনুসরণ করে থাকে। তবে এসব বেফাঁস কথা ও জবানদারাজির মূল উৎস হলো নয় বছর বয়সী আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে করার প্রেক্ষিতে প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে নিন্দা ও সমালোচনা।

সহিহ বুখারি নিয়ে কিছু কথা

সহিহ বুখারি সম্পর্কে কিছু কথা বলে নেই আগে। বুখারি কোন কৌতুক বা হাসি তামাসার বই নয়, বা সহিহ বুখারি মাটির নিচে পুতে রাখা কোনও গুপ্তধন নয় যে বারশ বছর পর জারাহ তাদিল সম্পর্কে কোন অজ্ঞ ব্যক্তি সেটি উদ্ধার করে পাঠ করা শুরু করেছে। বরং সহিহ আল বুখারির বয়স প্রায় বারো শতাব্দী, যেদিন এ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করা হয় সেদিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এ গ্রন্থটি হাদিস শাস্ত্রের সাধারণ ছাত্র থেকে নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে আসছেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম এ গ্রন্থের প্রতি তাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করে রেখেছেন।

আমি বলছি না যে শতশত স্কলার, বা এটাও বলছি না যে, হাজার হাজার স্কলার, বরং আমি সচেতনভাবেই বলতে পারি যে, লক্ষ লক্ষ তালেবে ইলম ও জ্ঞানী-গুণী সহিহ বুখারি পাঠ করেছেন, অধ্যয়ন করছেন এবং গবেষণা করছেন। তাদের কেউ কেউ হাদিসের সনদ নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা করছেন, আর কেউ কেউ হাদিসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে যাচ্ছেন। তাদের অনেকে ইমাম বুখারির হাদিসের শিরোনাম ও অধ্যায় নামকরণের ক্ষেত্রে তার বিবেচনা ও নির্বাচন রহস্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মোটকথা, সহিহ বুখারি হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ যা যুগের সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত জ্ঞানীগুণীরা আলোচনা-পর্যালোচনা করে এসেছেন এবং আজও করে যাচ্ছেন।

তবে সহিহ বুখারিতে সামান্য কিছু হাদিস রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অতীতে কিছু মুহাদ্দিস কথা বলেছেন। এ কথা মনে রাখতে হবে, বুখারি শরিফ একটি মানব প্রয়াস মাত্র, এটি কুরআন নয়। পৃথিবীর বুকে একমাত্র অমোঘ, অভ্রম ও ভ্রান্তিমুক্ত গ্রন্থ কেবল আল-কুরআন।

তবে মুহাদ্দিসগন যে হাদিসগুলোর ব্যাপারে কথা বলেছেন আমাদের আলোচ্য হাদিসটি তার মধ্যে নেই। যে কয়েকটি হাদিসের ব্যাপারে পূর্বেকার সত্যপন্থি আলেমগণ তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন সে কয়েকটি হাদিস ছাড়া বাকি সমস্ত হাদিস যুগ যুগ ধরে গৃহীত হয়ে আসছে, আজ পর্যন্ত একজন স্কলারও একটি হাদিসের ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেননি। এখন এ যুগের কোন ব্যক্তি যদি হঠাৎ এমন কোন মত নিয়ে আসে, যা অতীতের

কোন মুহাদ্দিস এরকম মত পোষণ করেননি, তখন ব্যাপারটি কেমন যেন হয়ে দাঁড়ায় না?

সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার হলো, সেই লোকগুলোর পড়াশোনা ও গবেষণার বিষয় কিন্তু হাদিসও না। এ যুগে যাদেরকে দেখা যায়, সহিহ বুখারির হাদিসের ব্যাপারে তাদের বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করতে, তাদের মধ্যে যারা আরব, তাদেরকে যদি হাদিসের সনদ পরিপূর্ণ তাশকিলসহ পাঠের আবেদন জানানো হয়, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, তারা সনদের সবগুলো রাবির নাম পর্যন্ত সঠিকভাবে পাঠ করতে পারবেন না। আমার তো মনে হয়, হাদিসের মূলপাঠও তারা তাশকিলবিহীন পড়তে হিমশিম খাবেন।

যদি তারা পারেনও, তবুও আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, তাদের এ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও নেই যে, ইমাম বুখারি এ গ্রন্থটিকে কীভাবে বিন্যস্ত করেছেন, কীভাবে সাজিয়েছেন বা স্কলারগণ এই গ্রন্থের কোথায় কেমন কী পরিমাণ ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করেছেন। কুরআনের পর সহিহ বুখারি হলো সবচেয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ। তাই এ যুগে কোন ব্যক্তির জন্য সহিহ বুখারির কোন হাদিস সম্পর্কে যয়িফ দাবি করা অসম্ভব।

বর্তমান সময়ে এসে তাদের একটি নির্দিষ্ট হাদিসের ব্যাপারে অর্বাচীন ও শিশুসুলভ মন্তব্য করার আসল কারণ প্রাচ্যবিদদের অসংযত ও অমূলক মন্তব্য ও বাজে কথা। এ যুগের ওয়ারেন্টালিস্ট তাদের লিখিত বইপত্রে প্রশ্ন তুলে চুয়ান্ন বয়সের একজন বয়স্ক মানুষ কীভাবে একজন নয় বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে করতে পারে? কারণ এ যুগে এরকম বিয়ে একটা ট্যাবু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সমাজে এখন এ ধরনের বিয়ে অগ্রহণযোগ্য।

আর অন্যদিকে মুসলিমরা নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরাজয়মূলক ও বশ্যতাসুলভ মনোভাব নিয়ে রক্ষা করার জন্য খুবই ব্যগ্র ও উৎসুক। তারা ওদের আপত্তি শুনে এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে।
আমাদের ভাবতে দাও ব্যাপারটি নিয়ে, এসো হাদিসের দিকে লক্ষ্য করি। আমাদের জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, বিয়ের বিষয়টাই আগাগোড়া অস্বীকার করে বলা যে, আমাদের নবি এমন কাজ করতে পারেন না। এভাবে আমরা ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলি, এসো।

এরপর তারা প্রাচ্যবিদদের ডাক দিয়ে বলে শোন, তোমরা যে হাদিস আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছ, সেটি যয়িফ, নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও নয় বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারেন না। তারা এসব করে মনে করে যে এভাবে ব্যাপারটা সমাধান হয়ে যাবে এটি একটি বশ্যতাসুলভ ও হীনমন্যতামূলক চিন্তাপদ্ধতি, তাদের এরকম হীনমন্যতার কারণ হলো, যে শিক্ষা সবচেয়ে প্রামাণ্য ও যথার্থ মূল্যবোধের উপর দাঁড়িয়ে সেই ইসলামি শিক্ষা নিয়ে তাদের হৃদয়ে গৌরববোধের অনুপস্থিতি। আমি বলি, আল্লাহর কসম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন এবং নয় বছর বয়সে তাকে ঘরে তুলে আনেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা কমবেশি নয় বছর বয়সে তাঁর সংসারে আসেন।

বুখারি শরিফে হাদিসটির সনদ এভাবে বর্ণিত আছে হিশাম বিন উরওয়া হাদিসটি তাঁর পিতা উরওয়া বিন যুবায়েরের থেকে বর্ণনা করেন, যিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ভাতিজা ছিলেন। আর উরওয়া তিনি হাদিসটি সরাসরি তাঁর ফুফু আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন।

বুখারির হাদিস নিয়ে তাদের আপত্তি

তারা বলেন, এ হাদিসটি সম্পর্কে প্রথম আপত্তি হলো, এ হাদিসটি উরওয়াই একমাত্র আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন, অন্য কেউই এই হাদিসটি শুনেননি, তাহলে এটা কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? দ্বিতীয়ত, একমাত্র হিশামই এ হাদিসটি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনিও একাই এটা বর্ণনা করেন, আর কেউ এ হাদিসটি বর্ণনা করেননি, সুতরাং এটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না, একজন থেকে একজন, তার থেকেও একজন।

এছাড়াও তৃতীয় আপত্তি যেটি সবচেয়ে বড় আপত্তি সেটি হলো, তারা বলেন যে, হিশাম বিন উরওয়া ছিলেন বার্ধক্যজনিত স্মৃতিবিকল রাবি। তারা দাবি করেন, তিনি যখন জীবনের শেষের দিকে ইরাকে চলে যান, তখন বার্ধক্যের কারণে তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ইমাম মালিক রহ. তাঁর থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন না। সুতরাং এই হাদিসটি যেহেতু গরিব সূত্রে (যে সনদে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাদিস বর্ণনাকারী সংখ্যা একজন হয়ে থাকে)

বর্ণিত, আর এর সনদে একজন দুর্বল স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি রয়েছে, তাই আমরা এ হাদিসটি গ্রহণ করতে পারি না।
এছাড়াও আরো একটি ব্যাপার হলো, তাঁর পরবর্তীতে যারাই এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন তারা সকলেই ইরাকের, আর এই ইরাকেই যখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন, তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন এই কারণেই যে, কারো যদি বার্ধক্যে তাঁর স্মৃতিশক্তি সবল না থাকে, তাহলে জারাহ ও তাদিল শাস্ত্রমতে তাঁর সমস্ত হাদিস অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায় না। আমরা যদি জানতে পারি যে সে কখন ও কোথায় স্মৃতিভ্রমের শিকার হয়েছেন, যেমনটি তাদের দাবি, ইরাকে তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে আমরা তাঁর থেকে ইরাকে বর্ণিত সমস্ত হাদিস বাতিল বলে গণ্য করব। আর যেহেতু মদিনায় তাঁর স্মৃতিশক্তি সবল ছিল, তাই আমরা তাঁর মদিনার সকল হাদিস গ্রহণ করব। আচ্ছা, আমরা এসব কিভাবে জানব? আমরা এটা জানতে পারি, মদিনা ও ইরাকের হাদিস বর্ণনাকারীদের কাছে থেকে। তাদের দাবি যে, হিশাম বিন উরওয়া থেকে যারাই এই হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা সকলেই ইরাকের অধিবাসী, এটাই তাদের যুক্তি। আর তাদের অভিযোগ হলো, হিশাম বিন উরওয়া বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যে হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন সেসব ছিল ইরাকে।

যদি পুরোধা ও প্রবীণ হাফেজে হাদিস ও মুহাদ্দিসগণ যেমন আল বাজ্জার যিনি দশ লাখ হাদিস মুখস্ত করেছেন বা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের মত মহান কোন মুহাদ্দিস এই অভিযোগ তুলতেন, তাহলে আপনি এ ধরনের একটি অভিযোগকে সত্য বলে ধরে নিতে পারতেন। জারাহ ও তাদিল বা হাদিসের মান নির্ণয় ও শ্রেণীবিভাজন এমন একটি জ্ঞান যার সাথে তীরবিহীন সমুদ্রের কেবল তুলনা করা যেতে পারে। যদি একবার সে সাগরে আপনি ডুব দেন, তাহলে সে অথৈ সাগরে আপনি সাঁতার কাটতেই থাকবেন, সাঁতার কাটতেই থাকবেন, কোন কূলকিনারা পাবেন না। তাই চিন্তা করে দেখুন, হাদিস শাস্ত্রের এই শাখাটি কতটা বিশাল ও বিস্তৃত।

আসুন, এবার তাদের আপত্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। তাদের *প্রথম* যে অভিযোগ একমাত্র উরওয়া হাদিসটি আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন এটি সম্পূর্ণ একটি মিথ্যা দাবি। মূলত হাদিস শাস্ত্রে তাদের জ্ঞান খুবই স্বল্প ও সীমিত, আয়েশা থেকে এ হাদিসটি আরো পাঁচজন বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান ও তথ্য দিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে, এখানে আবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। তাদের যদি হাদিস শাস্ত্র সম্পর্কে সামান্য মৌলিক জ্ঞান থাকত, তাহলে তারা সামান্য অনুসন্ধান করলেই বাকি বর্ণনাগুলো পেয়ে যেত।

উরওয়া ছাড়াও আর পাঁচজন এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হলেন আল আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ, আল কাসিম বিন আব্দুর রহমান, আল কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর, আমরাহ্ বিনতে আব্দুর রহমান, ইয়াহিয়া ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাতিব এবং উরওয়া বিন যুবায়েরকে নিয়ে মোট ছয়জন হাদিসটি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেন।

***দ্বিতীয়* অভিযোগটি হলো:** হিশাম কেবল একাই হাদিসটি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। অথচ উরওয়া ছাড়া আরো দুইজন হাদিসটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেন। তারা কারা?
প্রথমত, হিশাম বিন উরওয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। এরপর আমরা ইবনে শিহাব যুহরিকে দেখতে পাই তিনি এই হাদিসটি বর্ণনা করেন, এ সূত্রটি সহিহ মুসলিমে উল্লেখ আছে। তৃতীয় আমরা দেখি যে, হাদিসটি আবু হামজা মায়মুন মাওলা উরওয়া তিনিও বর্ণনা করেন। এদের তিনজনই উরওয়া বিন যুবায়েরের থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

এবার *তৃতীয়* বিষয়টিতে আসা যাক, তিনি ইরাকে মতিভ্রমের শিকার হন, আর যারাই তাঁর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন তারা সকলেই ইরাকের। তাদের দাবি, তিনি মদিনায় স্মৃতিভ্রমের শিকার হননি, ইরাকেই হয়েছিলেন, তাই তিনি মদিনায় যে হাদিস বর্ণনা করেন আমরা সে হাদিস নির্দ্বিধায় গ্রহণ

করতে পারি। হাদিস শাস্ত্রে তাদের জ্ঞানের পরিধি বড়ই সঙ্কুচিত, অনেক বর্ণনাকারী তাঁর থেকে এ হাদিসটি মদিনায় বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে সাকওয়ান, আব্দুর রহমান ইবনে আবি আযযিনাদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে উরওয়া সকলেই হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে মদিনায় হাদিসটি বর্ণনা করেন। আর মক্কায়, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা হিশাম ইবনে উরওয়া থেকে হাদিসটি গ্রহণ করেন। তিনি যখন রায়-এ আসেন, তখন তিনি এ হাদিসটি প্রচার করেন। রায়-এ যারা তার থেকে হাদিসটি গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন জারির আদ্দুব্বি। বসরায় বর্ণনা করেন তাঁর থেকে হাম্মাদ ইবনে সালামা, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ও আরো অনেকে।

তাদের দাবি ছিল, মদিনা, বাসরা, রায় এবং মক্কা কোথাও বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার আগে কেউই হাদিসটি তার থেকে গ্রহণ করেননি। যেহেতু তারা দাবি করেছে কেউই তার থেকে মদিনায় হাদিসটি গ্রহণ করেননি, তাই একজন ব্যক্তিও যদি মদিনায় এই হাদিসটি বর্ণনা করে থাকেন, তাহলে তাদের দাবি ও আপত্তি এখানেই ভুল ও অমূলক হিসবে প্রমাণিত হয়ে যায়।

তবে আমরা এখানে শেষ করব না, তাদের যে দাবি, তিনি স্মৃতিভ্রমের শিকার হন, এ ব্যাপারটিতে আমাদের আপত্তি আছে। তিনি স্মৃতিভ্রমের শিকার হননি, এটি হিশাম ইবনে উরওয়ার বিরুদ্ধে একটি নির্জলা মিথ্যাচার। বাস্তবে বার্ধক্যেও তার স্মৃতিশক্তি অটুট ও শক্তিশালী ছিল। তার স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার যে তথ্য তারা উপস্থাপন করেছে সেটির উৎস হলো الوهم والإيهام নামক কিতাবটি। আমি এই গ্রন্থটি পড়েছি, এতে আবুল হাসান ইবনুল কাত্তান বইটির দুটি স্থানে হিশাম বিন উরওয়ার কথা উল্লেখ করেন। একটিতে তিনি তাকে স্মৃতিভ্রমের শিকার হিসেবে উল্লেখ করেন, অন্য স্থানে তিনি কেবল শুধু তার নাম উল্লেখ করেন।

তবে ميزان الاعتدال-এর চতুর্থ খণ্ডে যে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করে তার সেই অভিযোগ আয-যাহাবি রহ. খণ্ডন করেন।

هشام بن عروة أحد الأعلام حجة إمام لكن فى الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدا ولا عبرة بما قاله أبو الحسن بن القطان من أنه وسهيل بن أبى صالح اختلطا وتغيرا نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه هو فى حال الشبيبة فنس بعض محفوظه أو وهم فكان ماذا !أهو معصوم من النسيان ! ولما قدم العراق فى آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم فى غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها ◉ ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات ◉ فدع عنك الخبط ◉ وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين ◉ فهشام شيخ الإسلام ◉ ولكن أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن القطان ◉ وكذا قول عبد الرحمن بن خراش : كان مالك لا يرضاه ◉ نقم عليه حديثه لأهل العراق.

তিনি বলেন, জীবনের শেষের দিকে তার মুখস্থশক্তি কমে গিয়েছিল। লক্ষ্য করুন, তিনি কিন্তু এ কথা বলেননি যে, তিনি স্মৃতিভ্রমের শিকার হয়েছিলেন, বরং তিনি বলেছেন, তার মুখস্থশক্তি কমে গিয়েছিল। দুই কথার মধ্যে অনেক ব্যবধান।

অতঃপর আল্লামা যাহাবি রহ. বলেন, আবুল হাসান ইবনে কাত্তানের কথা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লামা যাহাবি রহ. তার মতামতকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর ইমাম যাহাবি হলেন জারাহ ওয়া তাদিলের একজন বিশিষ্ট ইমাম, তিনি বলেন, বয়স হলে তার স্মরণশক্তি সামান্য কমে আসে। তার স্মৃতিশক্তি ঠিক যৌবনকালের মতো ছিল না, তিনি কিছুটা ভুলে যেতেন।

আল্লামা যাহাবি রহ. আরো বলেন, তিনি ইরাকে সামান্য হাদিস বর্ণনা করেছেন, তবে তা ছিল খুবই স্বল্প। অতঃপর তিনি আরো বলেন, বৃদ্ধ বয়সে মুখস্থশক্তির মধ্যে সামান্য দুর্বলতা তো ইমাম মালিক, শুবাহ এবং ওয়াকি রহ.-দের ব্যাপারেও ঘটেছিল।

আমরা তো তাদের থেকে হাদিস গ্রহণ করি, তাদের বিরুদ্ধে তো স্মৃতিভ্রমের অভিযোগ আরোপ করি না। সর্বশেষ তিনি হিশাম রহ.-কে জোরালো সমর্থন জানিয়ে বলেন, তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম। ইমাম যাহাবি রহ. থেকে এরকম প্রশংসাপূর্ণ সম্বোধন অনেক বড় ব্যাপার। আর সর্বশেষে তিনি আল-কাত্তানর বিরুদ্ধে তার অযাচিত ও স্পর্ধিত উক্তির জন্য কঠিন ভাষা ব্যবহার করেন।

ভিন্ন একটি পাদটিকাতে আমি পড়েছিলাম, যে ব্যক্তিকে তারা স্মৃতিবিভ্রম বলেছে, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. যমযমের পানি পান করে আল্লাহ তা`আলার দরবারে দোয়া করেন যেন আল্লাহ তা`আলা তাকে হাদিস শাস্ত্রে সেই হিশামের মত প্রাজ্ঞতা দান করেন। ভাবুন, এবার তারা কত মহান একজন মানুষের উপর কী ধরনের অভিযোগ আরোপ করেছে! ইয়াকুব ইবনে শায়বা বলেন, তিনি হাদিসের ক্ষেত্রে ইমাম, মুহাম্মাদ বিন সাদ বলেন, তিনি সিকাহ ও হুজ্জাহ, হাদিস বর্ণনাকারীদের অন্যতম উচ্চতর স্তর হলো সিকাহ।

তারা বলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লহু আনহা থেকে মাত্র একটি বর্ণনা আছে, আর আমরা প্রমাণ করলাম তার থেকে আরও পাঁচটি বর্ণনা রয়েছে। তারা বলল, মাত্র একজন ব্যক্তি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, আমরা প্রমাণ করে দেখালাম আরো দুজন ব্যক্তি তার থেকে বর্ণনা করেন। তারা বলল, উরওয়া থেকে আমরা কেবল মদিনার হাদিস গ্রহণ করব, যেহেতু তিনি সেখানে স্মৃতিবিভ্রম হননি, আমরা এও প্রমাণ করলাম, মদিনা, মক্কা, বাসরা ও রায় এ এমন অনেকেই ছিলেন যারা তার কাছে থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

আর সর্বশেষে আমরা প্রমাণ করে দেখিয়েছি, তার স্মৃতি ভ্রষ্ট হয়নি, এ ব্যাপারে যাহাবি রহ: এর উক্তি ও আবুল হাসান আল কাত্তানের ব্যাপারে তার শক্ত ভাষা প্রয়োগের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি।

সহিহ বুখারির হাদিস নবীজি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নয় বছর বয়সে বিয়ে করার আরো অনেকগুলো বর্ণনা আছে, তাদের উচিৎ ছিল হাদিসগুলো তালাশ করে পাঠ করা। সহিহ মুসলিমেও এ বিষয়ে হাদিস আছে। যদি

বুখারির হাদিস নিতে তাদের সমস্যা থাকে, তাহলে সহিহ মুসলিমের হাদিস নিচ্ছে না কেন? তাহলে তাদের কি সহিহ মুসলিমের হাদিসের ব্যাপারেও আপত্তি আছে?

মুসলিমের হাদিসের সনদে তো হিশাম বিন উরওয়াও নেই। তাহলে কেন তারা সে হাদিসটি নিচ্ছে না? মুসলিমের হাদিসের সনদ হলো, মুয়াম্মার যুহরি থেকে, তিনি উরওয়া থেকে এবং তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে। সেখানে তো হিশাম বিন উরওয়া নেই। যেহেতু হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমে একত্রে বর্ণনা আছে, তাই এখানে এই হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করারই প্রয়োজন ছিল না। আলোচনার প্রয়োজন তখনই হত যখন তারা সহিহ মুসলিমের হাদিসটিকে দুর্বল ঘোষণা করত, তবে তাদের কেউই এ হাদিসটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য যেমন করেনি, তেমনি এর সনদ নিয়েও কোন আলোচনা করেনি।

তাদের এই নির্দিষ্ট হাদিস সম্পর্কে এরকম অযাচিত মন্তব্য ও অপব্যাখ্যার কারণ এই যে, প্রাচ্যবিদদের মধ্যে কয়েকটি কুকুরের দল বলে যে, কীভাবে চুয়ান্ন বছরের একজন ব্যক্তি নয় বছরের একটি মেয়েকে বিয়ে করে। যারা হাদিসটি দুর্বল হিসেবে প্রমাণ করার জন্য নানা কথা বলে তারা ইউরোপীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকে স্ট্যান্ডার্ড মনে করে।

আমরা তো তাদের চিৎকার-চেঁচামেচি কারণে ইসলামকে সফট ও কিউট একটি ধর্ম হিসেবে পেশ করতে পারি না। যেহেতু এই হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আছে, সেহেতু এখনে কোন কথা বলারই অবকাশ নেই, নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে আমাদেরকে এটি মেনে নিতে হবে। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাই মূলত ভ্যালু ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড, তিনি যা করেছেন আমাদের কাছে সেটি নৈতিকতার উৎসে পরিণত হয়েছে।

এই হাদিসটি বুখারিতে আছে এবং মুসলিম ও আবু দাউদে যে বর্ণনা আছে সেখানে হিসাম বিন উরওয়া নেই। সুনানে নাসায়িতে তিনটি পৃথক বর্ণনা রয়েছে হিসাম বিন উরওয়া ছাড়া।

সুনানে ইবনে মাজাহ এবং মুসনাদে আহমদের ষষ্ঠ খণ্ডে বিয়ের পুরো ঘটনা আছে, খাওলা বিনতে হাকিম কীভাবে রাসূলের কাছে আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব দেন। এই হাদিসটির শেষে উল্লেখ আছে, যখন রাসূলের সংসারে আয়েশা আসেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর। এই হাদিসটি সুনানুল বায়হাকির ষষ্ঠ খণ্ডে আছে, যেখানে তিনি এই হাদিসটি ব্যাখ্যা করেন। মুস্তাদরাক আল হাকিমে রয়েছে এবং মুজামুল কাবিরে তিনটি ভিন্ন বর্ণনায় আছে।

সম্মানিত পাঠক, এই হাদিসটি বুখারি ছাড়া আর আটটি হাদিসের গ্রন্থে অধিকাংশেই হিশাম বিন উরওয়া ছাড়া উল্লেখ আছে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের সম্পর্কে যা বলবেন সেটি সবচেয়ে শক্তিশালী মত, কারণ তিনিই তার নিজের সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানবেন, এটাই স্বাভাবিক। আর হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে থেকে যিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন বা তার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তারা এ ব্যাপারে পরবর্তীদের থেকে বেশি অবগত।

হাদিসের গ্রন্থ ছাড়াও ইতিহাসের অনেক গ্রন্থই তার বিয়ের বয়স নয় বছর হওয়ার তথ্যটি সমর্থন করে। ইচ্ছা করলে আপনারা সিয়ারে আলামু নুবালার দ্বিতীয় খণ্ড খুলে দেখতে পারেন, সেখানে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনী আছে। গ্রন্থটিতে উল্লেখ আছে, আমি ফাতেমার রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আট বছরের ছোট ছিলাম, তিনি আরো বলেছেন, আমি যখন বড় হই, সেসময়টা আমরা শুধু ইসলাম ধর্মের কথাই জানতাম।

الإصابة গ্রন্থে ইবনে হাজার আস্কালানি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা উল্লেখ করেন। আযযাহাবি ও ইবনে হাজারের বক্তব্যে এই তথ্যটি উঠে আসে যে, তাঁর যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স আট অথবা নয় বছর ছিল। দুই বর্ণনায় কয়েক মাসের হেরফের রয়েছে। কারণ, আরবেরা সাধারণত ভগ্ন অংশ বর্ণনা করার সময় তা পূর্ণ করে বাড়িয়ে বলে বা তা বাদ দিয়ে কমিয়ে বলে।

ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন, তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বয়স ছিল আঠার বছর। যদি নবীজির মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স আঠার হয়ে থাকে, তাহলে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, হিজরতের সময় ও বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

সিরাত ও জীবনী গ্রন্থে রয়েছে, যখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ছেষট্টি বছর, হিজরতের সাতান্ন বছর পর। যদি হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল আঠার, আর যখন তিনি হিজরত করেন ও বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর।

সাধারণত ঐতিহাসিক কোন তথ্য যদি হাদিসের সমান্তরালে আনা হয়, তাহলে দেখা যায় এতে অনেক গড়মিল থাকে, আর হাদিসের সাথে এটা মিলে না। এই অমিল দেখা দেওয়ার কারণ হিসবে আবু জাফর আত-তাবারি রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আত-তারিখে বলেন, „যদি আমার এই গ্রন্থে কোন ঘটনা, তথ্য বা ঐতিহাসিক কোন বর্ণনা তোমার কাছে মিথ্যা, অসত্য ও অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাহলে আমি সেটির দায়ভার গ্রহণ করতে অক্ষম। কারণ আমি অনেক ঘটনা বর্ণনাকারীদের থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারিনি।„

মুহাদ্দিসগণ যেভাবে ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন, ইতিহাসবিদগণ সেভাবে তা লিপিবদ্ধ করেন না। সাধারণত ঐতিহাসিক গ্রন্থে সনদ ও সূত্র বর্ণনা করা হয় না, এমনকি অনেক সময় সত্যতা ও বাছ-বিচার ছাড়াই সব ধরনের বর্ণনা এখানে স্থান পায়। তাদের অনেক বর্ণনাই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার একশ বছর পর, তাই এ ধরনের বর্ণনা কোন হাদিসের বিরুদ্ধে আমরা প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারি না।

আমরা যদি কোন ইতিহাসগ্রন্থ কোন ঘটনার সত্যতা বিচার করার জন্য পেশ করতে চাই, তখন সেই গ্রন্থ বা বর্ণনাকে আমাদের হাদিসের মত

যাচাইবাছাই করতে হবে, এটা তখনই করা হবে যখন তা হাদিসের বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হবে।

এছাড়াও তারা আরও কিছু যুক্তি দেখায় তাদের কথা প্রমাণ করার জন্য, সেটি যদিও আমি খণ্ডন করতে পারব, তবে এসবের পিছনে সময় নষ্ট করা অনর্থক। যেহেতু এটি বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তাই এটির সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আর হিশাম বিন উরওয়া স্মৃতিবিভ্রম নন, আর যদি তা ধরেও নেই, তিনি তো এই হাদিস মদিনায় বর্ণনা করেছেন। তাই এই হাদিসের সত্যতা নিয়ে কারো কোন বিতর্ক করার সুযোগ নেই।

মূল সমস্যা যেখানে

আসলে গোলটা বাঁধে তখনই যখন মুসলমান ইউরোপিয়ান লাইফস্টাইলকে নিজেদের আদর্শ মনে করে এবং যখন তাদের ভ্যালু ও মূল্যবোধ মুসলিমরা নিজেদের নৈতিকতার অভ্রান্ত উৎস হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। একজন কমবয়সী মেয়েকে একজন বয়স্ক পুরুষের বিয়ে করাকে যখন ওরা ট্যাবু হিসেবে দেখায়, তখন তারা যারপরনাই আনুগত্য ও একরাশ হীনমন্যতা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মর্যাদা বাঁচানোর জন্য প্রাচ্যবিদদের খুব সহজেই বলে দেয়, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্ললাহু আনহাকে কম বয়সে বিয়ে করেননি। তোমরা যে হাদিস উল্লেখ করেছ সেই হাদিসের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

অথচ মুসলমানের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ও আচরণবিধিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ম ও আচরণ। এ প্রাথমিক মূলনীতি মুসলমানদের জেনে রাখতে হবে।

আমরা আবু বকর রা: এর ঐতিহাসিক ঘটনা ও তাঁর জীবনী পড়ে কাঁদতে থাকি। যখন ইসরা ও মেরাজের বিস্ময়কর ঘটনার কথা তিনি শুনতে পান, এবং সবাই তাকে জিজ্ঞাস করতে শুরু করে, এই! তুমি কি বিশ্বাস কর যে, তোমার বন্ধু মাসজিদুল আকসা ও সাত আসমান ঘুরে সেখান থেকে এত দ্রুত ফিরে আসেন যে, যাওয়ার সময় তিনি বিছানা

যেরকম গরম রেখে গিয়েছিলেন ফিরে এসে সেরকমই পান? আমরা কাঁদতে কাঁদতে সেই ঘটনা পড়ি, তিনি বলেন, যদি মুহাম্মাদ এটি বলে থাকেন, তাহলে তিনি সত্য বলেছেন।

আমরা রাসূলের গর্বিত অনুসারী, দাওয়াতের জন্য আমাদের সুন্দরতম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ, এর সাথে আমিও একমত। যখন ওয়েস্ট জাহিলিয়্যাতের কর্দমায় লেপটে ছিল, তখনও আমরা বিনম্রভাবে ও উত্তম পন্থায় তাদেরকে সম্বোধন করেছি যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

হে নবী! প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সদুপদেশ সহকারে তোমার রবের পথের দিকে দাওয়াত দাও এবং লোকদের সাথে বিতর্ক করো সর্বোত্তম পদ্ধতিতে। তোমার রবই বেশি ভালো জানেন কে তাঁর পথচ্যুত হয়ে আছে আর কে আছে সঠিক পথে। [১৬: ১২৫]

তবে যারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপমানিত করতে চায়, তাদেরকে আমরা কঠোর ভাষায় বলব, তোদের জীবনাচার ও লাইফস্টাইল বিশ্বে নিকৃষ্টতম ও সবচেয়ে নোংরা হিসেবে প্রমাণিত। রাসূলের জীবন নিয়ে কথা বলার স্পর্ধা দেখানো তোমাদের মানায় না।

সি. এন. এন.-এর একটি মেডিক্যাল রিপোর্টে আছে, মেয়েদের নয় বছর বয়সে তাদের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, এছাড়াও অন্যান্য মেডিক্যাল রিপোর্টে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে মেয়েরা অন্যদের তুলনায় আগে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হয়।

ইমাম আশ-শাফি রহ. বলেন, আমি একুশ বছর বয়সী দাদী, দেখেছি। ইবনুল জাওজি থেকেও হুবুহু বক্তব্য পাওয়া যায়, সুতরাং এটা ছিল অতীতের একটি রীতি।

যদি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিত্রহীন ও নারীকামুক হতেন, তাহলে তিনি তাঁর চেয়ে পনের বছরের বড় কোন নারীকে বিয়ে করে তাঁর সাথে পচিঁশ বছর ঘরসংসার করতেন না। স্ত্রীর সম্পদ ও তাঁর নিজের সম্পদ তাঁর অধিকারে ছিল, অথচ তখন কেবলমাত্র চারটি বা দশটি না একশ বিয়ে করার প্রথা ছিল, তখন বিয়ের কোন সীমারেখা ছিল না, ইসলাম এসেই সর্বপ্রথম বিয়ের সংখ্যায় লাগাম টানে,এত কিছুর পরেও তিনি পনের বছরের বড় একজন নারীর সাথে জীবন ও যৌবনের পুরোটা সময় কাটিয়ে দেন।

যেমন ছিলেন আয়েশা

যারা নিজেরা পশুর মত জীবন কাটায়, নবীজির সমালোচনা করতে আসে তাদের বলে রাখি, আমাদের মেয়েরা কেবল শারীরিকভাবেই দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে না, তারা মানসিকভাবেও দ্রুত পরিপক্কতা অর্জন করে।

আয়েশা রাঃ দুই হাজার দুই শ, দশটি [২২১০] হাদিস মুখস্থ করেন। তাঁর কেবল মুখস্থশক্তি ভাল ছিল, তাই-ই না, তিনি অত্যন্ত মেধাবীও ছিলেন।

আয-যুহরি রহ. বলেন, *"তাঁর সময়ের যত নারী ছিল তাদের সকলের জ্ঞানকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর আয়েশা রা.-এর জ্ঞানকে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে আয়েশার পাল্লায়ই বেশি ভারি হবে।„*

উরওয়া বিন যুবায়ের রা. বলেন, *"আমি ফিকহ, কবিতা চিকিৎসা শাস্ত্রে আয়েশা রা.-এর থেকে জ্ঞানী কাউকে দেখিনি।„*

ইবনে আব্দিল বার বলেন, *„আয়েশা রা. ফিকহ, চিকিৎসা ও কবিতায় যুগসেরা ছিলেন।„*

সুতরাং তিনি ছিলেন জ্ঞান প্রাচুর্যে অনন্য, তার এই মেধা ও বুদ্ধিমত্তা কখন প্রকাশ পায়? যখন তিনি বালিকা ছিলেন ঠিক তখন থেকেই। অবুঝ, সরল বা অর্বাচীন এরকম কোন মেয়ে তিনি ছিলেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে হওয়ার আগে যুবায়ের বিন মুতয়িম নামে এক ব্যক্তির সাথে তার বিয়ের কথা হয়েছিল। তাকে বিয়ে কারার কথা ওঠে খাওলা বিনতে হাকিমের মাধ্যমে। তিনি রাসূলের কাছে এসে বলেন, তোমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করার পর কেন তুমি বিয়ে করছ না? তিনিই আয়েশা রা: এর প্রস্তাব দেন।

হতবুদ্ধ পাদ্রী

একবার এক পাদ্রীর সাথে এ বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল আমার, আমি অবশেষে অনেক কথা হওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাস করলাম, „যখন যীশু জন্মগ্রহণ করেন তখন মেরির বয়স কত ছিল?„ তিনি বলেন, „হবে হয়ত তের বা চৌদ্দ, আমার ঠিক মনে নেই।„ আমি তখন বললাম, „একজন চৌদ্দ বছরের মেয়ে আবার সন্তান জন্ম দেয় কীভাবে! এটা তো জুলুম হয়েছে, জঘন্য অবিচার। চৌদ্দ বছর বয়েসে বাচ্চা জন্ম দেওয়া তো একটি মস্ত বড় ভুল পদক্ষেপ।„

আমি তাকে উত্তেজিত করার জন্য এভাবে বলে যাচ্ছিলাম। সে তখন বলে বসে, „তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে সেটা খারাপ ছিল না, এটি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।„ তখন আমি বললাম, „আমি ইচ্ছা করেই তোমাকে তখন বলিনি, আমার দেখার বিষয় ছিল, তুমি কী বল। সে যুগে এ বয়সে বিয়ে করা একটি স্বাভাবিক রেওয়াজ ছিল।„

فَبُهِتَ الَّذِى كَفَرَ

একথা শুনে সেই সত্য অস্বীকারকারী হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। [২: ২৫৮]

যখন আমি এভাবে তার মুখ থেকেই উত্তরটা বের করে নিয়ে আসি, তখন আর একটা কথাও তার মুখ থেকে বের হয়নি।

নবীজির উপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস রাখতে হবে এবং তাকে নিয়ে আমাদের গর্ব করতে হবে। যত ধরনের অপবাদ থাকতে পারে আমাদের কল্পনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সবগুলোই আরোপ করা হয়েছে, জাদুকর, কবি, গণক, তার প্রতি অভিযোগ করা হত, শহরে

উপকণ্ঠে গিয়ে তিনি কয়েকটি আরবি বাক্য শিখে মক্কায় এসে দাবি করতেন যে, এটি ওহি, তিনি স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ লাগতেন।
এমন খারাপ কিছু নেই, যার মিথ্যা আপবাদ আমাদের প্রিয় রাসূলকে বইতে হয়নি। তবে তাদের কাউকে কখনও বলতে শোনা যায়নি যে, তিনি শিশুকামী ছিলেন। কেন তাকে বলা হয়নি? কারণ, তখন ব্যাপারটা ট্যাবু ছিল না।

ওদের হাস্যকর যত আইন

কত বছর বয়সে বর্তমানে আমেরিকায় বিয়ে করা যায়? বিয়ের বয়সে একেক দেশে একেক রকম বয়সের সীমা থাকে। কারণ, এটি যতটা না বয়সের সাথে সম্পর্কিত তার চেয়ে বেশি বয়ঃসন্ধির সাথে সম্পর্কিত।

তাদের আইনকানুন শুনলে হাসি পায়, কোন মেয়ের যদি এক দিন কম ষোল বছর হয় এবং সে যদি আঠারো বছরের উর্ধ্বে কোন পুরুষের সাথে মেলামেশা করে, তাহলে পুরুষটি জেলে যেতে পারে, যদিও একদিন পরে ব্যাপারটি বৈধ হয়ে যায়। একদিন তাদের কাছে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি করে। তাদের একটি প্রদেশে হয়ত, ষোল বছরের মেয়ের সাথে মেলামেশা করা যায়, আবার সাথে ঘেঁষা আরেক প্রদেশে ষোল বছর বয়সের মেয়ের সাথে মেলামেশা করার জন্য জেলে যেতে হবে।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

(যদি এরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের ফায়সালা চায় ? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভাল ফায়সালাকারী আর কেউ নেই। [৫: ৫০]

এটা কি কোন নীতি ও আদর্শ হতে পারে? যদি কেউ তাদের আইনকানুন নিয়ে হাসিঠাট্টা করার অধিকার রাখে, সেটা কেবল আমরাই পারি তাদের আইনবিধি নিয়ে মশকরা করতে, কারণ তাদের বিধিবিধানের কোন অর্থ নেই, মাকড়সার জালের থেকেও সেসব দুর্বল। আজ সেই মুসলিম কোথায় যারা নিজের দ্বীনের প্রতিটি বিয়স নিয়ে গর্ববোধ করবে?

তাদের এই জগাখিচুড়ি আইনের হযবরল অবস্থা এখানেই শেষ নয়। তারা এ ব্যাপারে এখনও একমত হতে পারেনি, ঠিক কত বছর বয়েসে কারো বিয়ে করা উচিৎ।

আমার যেহেতু আইন নিয়ে কিছু পড়াশোনা আছে, তাই আমি এ ব্যাপারে কিছু জানি। আমেরিকার একেক স্টেটে একেক রকমের শর্তাদি রয়েছে। যদি বিয়েটি বারো ও তেরো বছর বয়সীর মধ্যে হয় তাহলে এটি অনুমোদনযোগ্য, আঠারো বছর বয়সীর সাথে চৌদ্দ বা সতের হতে পারে, আবার ষোল ও চৌদ্দ বছর বয়সীর সাথে কোন বাঁধা নেই। এরকমের কত শত শর্ত! সেখানে বিয়ে নিয়ে বিস্তারিত অনেক নিয়মনীতি রয়েছে যার কোন অর্থ নেই, এত শত শর্ত ও নিয়মের পরেও তারা কোন একটি বিষয়ে ঐক্যমত হতে পারেনি।

২০০৮ এ-ও কানাডায় বিয়ের বৈধ বয়স ছিল ১৪ থেকে ১৮। ২০০৮-তে তারা একটি ভয়ানক অপরাধ আইন পাশ করে বিয়ের বয়স পরিবর্তন করে ফেলে। এখন আমাদের এমনিতেই প্রশ্ন আসতে পারে, এতো শত শত বছর কেন চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারত এবং সে সাবালিকা ও ম্যাচুরড হিসেবে গণ্য হত, হঠাৎ ২০০৮ তে তাদের কী হলো? কেন তারা বিয়ের বয়স সংশোধন করলে? উত্তর হলো, এসবের কারণ হচ্ছে স্ববিরোধী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। আমাদের আইনই কেবল সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন মেয়ে যদি সাবালিকা হয়, তখনই কেবল সে বিয়ে করতে পারে যদি সে চায়। আল্লাহর কসম করে বলছি, তাদের আইনের কোন ভিত্তি নেই। আমাদের এমন কিছু নেই যে যার জন্য আমাদের লজ্জা করতে হবে। আল্লাহর কসম, যদি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের সকল মানুষ একযোগে একসাথে রাসূলের কাজ ও কর্মে সমর্থিত কোন কাজের বিপরীতে অবস্থান নেয়, আমি তখনও বলব, তিনিই সঠিক অবস্থানে আছেন, আর বিশ্বের তাবৎ মানুষ ভুলের মধ্যে আছে।

একটি মজার ঘটনা

তোমরা নিজেদের শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে গর্ব কর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে গর্ববোধ কর। অপদার্থ ও পূতিগন্ধ প্রাচ্যবিদ যাদের সারাটি জীবন ইসলামকে আঘাত করার জন্য ব্যয় হয় তাদের খুশি করার জন্য আগ্রহ উদ্দীপনা নিয়ে হাদিসের মধ্যে ভ্রান্তি তালাশ করতে যেয়ো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে গর্ব কর।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে, আমার মনে পড়ে, একটি ছাত্র আমাকে বলেছিল, সে একবার পাবলিক রেস্টরুমে অজু করছিল, তখন এক লোক আসে। সে পা ধোঁয়ার জন্য বেসিনে পা উঠালে লোকটি তখন বলে উঠে, আরে, আরে! করো কী তুমি! করো কী! তোমরা আসলে নোংরা ও অসভ্য একটি জাতি। মুসলিম যুবকটি তখন শান্ত কণ্ঠে বলে, আমি কি আপনার কাছে একটা বিষয় জানতে পারি? সে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন ছেলেটি বলল, আপনি দিনে কয়বার মুখ ধোন? সে তখন উত্তর দেয়, কেন, দিনে একবার। ছেলেটি তখন বলে, আমি তো দিনে পাঁচবার পা ধুই, আমার পা তো আপনার মুখের থেকেও বেশি পরিষ্কার। আমার পা বেসিনে যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।

তাই, বলি, ইসলাম নিয়ে গর্ব কর, ইসলামের আদর্শ নিয়ে গর্ব কর।
আমরা দাওয়াত ভালবাসি, আমরা দাওয়াতের জন্য সবচেয়ে ভাল ও উত্তম পথ গ্রহণ করি। অমুসলিমদের মধ্যে যারা দ্বীন জানতে চায়, তাদের জন্য আমার লেকচারগুলো আপনারা হয়ত শুনে থাকবেন।

তবে যখন তারা আমাদেরকে আক্রমণ করতে চায় তখন আমরা তাদের সাথে আমরা বসতে পারি না, আল্লাহর কসম করে বলছি, তখন আমরা বলতে পারি না, আমাদের হাদিস দুর্বল, আমি কীভাবে ইলম গোপন করতে পারি, আমাদের পক্ষে কীভাবে সম্ভব তাদের সাথে আপোষ করা? আমরা কখনই তা করতে পারব না। তাদের বাড়ি কাঁচের তৈরি, তা সত্ত্বেও সেখান থেকে তারা আমাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারে। তোমার

বাড়ি যেহেতু কাঁচের তৈরি, সেহেতু কাউকে তোমার পাথর মারা উচিৎ না।

আমরা হিকমত ও প্রজ্ঞার কথা বলি, তবে যদি তারা আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা তাদের দেখিয়ে দিব, যে তাদের আইনকানুনই বিশৃঙ্খল, এলোমেলো ও হাস্যকর, আমাদেরটা না। যারা দ্বীন শিখতে চায়, জানতে চায়, তাদের জন্য আমরা আমাদের মনপ্রাণ উজাড় করে দেব, তাদের প্রতি আমরা কোমল ও সদয় হব, যারা দ্বীনকে জানতে আগ্রহী তাদের মাঝে এবং প্রাচ্যবিদেরা যারা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত অসৎভাবে আক্রমণ করে আসছে তাদের মাঝে বিশাল পার্থক্য আছে। দ্বীনের দাওয়াত ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপে পার্থক্যটা ঠিক এ জাগাতেই, তাই ইন্টারফেইথ মূলত দাওয়াতের অংশ নয়।

অল্প বয়সে আয়েশা .রা-এর সাথে বিয়ে ও কিছু কথা

অনেক অমুসলিম কলহপ্রবণ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঞ্চাশ ঊর্ধ্ব বয়সে আয়েশা রা.-কে, তাদের ধারণা অনুযায়ী অল্প বয়সে বিয়ে করাকে নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজ হিসেবে দেখে থাকে। তাদের এই অভিযোগের অন্তরালে তারা রাসূলের প্রতি এই অভিযোগই দায়ের করে থাকে যে, তিনি মূলত আয়েশা রা. অনুভূতি ও মতামতকে অগ্রাহ্য করে তার নিজের পছন্দ ও ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২]

অভিযোগ ও সংশয়ের জবাব

সংক্ষিপ্ত

এক: আয়েশা রা.-এর সাথে অল্প বয়সে বিয়ের ব্যাপারটা সেসময়ের বিচারে মোটেই নতুন কোন বিষয় ছিল না, কারণ এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে করা তৎকালীন সমাজের একটি সাধারণ প্রথা ও রেওয়াজ ছিল।

---

২ موسوعة بيان الإسلام: القسم الثاني المجلد الأول من الجزء الأول ১০২-১০৭

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও তৎকালিক সমকালকে পৃথক করে শুধু মাত্র ঘটনা বর্ণনা করা একটি মারাত্মক পর্যায়ের ভুল। এছাড়াও, আয়েশা রা. বিয়ের সময় শিশু ছিলেন না, বরং তিনি পূর্ণ সাবালিকা ছিলেন, কারণ, এর আগে তার জন্য যুবায়ের বিন মুতয়িম বিন আদির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়।

দুই: আয়েশা রা.-এর সাথে নবীজির বিয়ের হওয়ার সাথে অনেকগুলো লক্ষ্য ও হিকমত জুড়ে আছে, নবীজির সাথে আবু বকর রা.-এর সম্পর্ক আর দৃঢ় হওয়া এবং তার মাধ্যমে বিশেষত নারীবিষয়ক মৌখিক ও কর্মগত সুন্নাহ উম্মাহকে শিক্ষাদান। এই দাওয়াতি হিকমা ও শরয়ী মাকসাদের বিষয়গুলো তারা না জেনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্ন ধরনের মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে থাকে।

বিস্তারিত!

প্রথমত: কুরাইশ সম্প্রদায় ও তৎকালীন পরিবেশে রাসূলই সর্বপ্রথম অল্প বয়সী কোন মেয়েকে বিয়ে করেননি

ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রমাণিত যে, কুরাইশের কাফিররা যারা রাসূলের সামান্য কোন ভুল বা ত্রুটি তালাশে সদা ওঁত পেতে থাকত, যাতে যে কোন উপায়ে মানুষকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যায়, সেই কুরাইশদের কাছে যখন দুই প্রাণপ্রিয় বন্ধুর মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের সংবাদ পৌঁছে, তারা তখন স্বাভাবিকভাবেই এ ঘটনাকে গ্রহণ করে।

যদি এই বিয়েতে কোন মর্যাদাহানিকর বা অগৌরবজনক কিছু থাকত, তাহলে অবশ্যই কুরাইশীদের উচ্চবাচ্যে পুরো দুনিয়া উলটপালট হয়ে যেত। মুখে মুখে তখন শোনা যেত, এই মুহাম্মাদ কি সেই মুহাম্মাদ না, যিনি আমাদেরকে পবিত্রতা ও সচ্চরিত্রের প্রতি শিক্ষা দিতেন? তিনি কি সেই মুহাম্মাদ না যিনি আমাদেরকে সুমহান চরিত্রের কথা বলতেন?

তখন এরকম কিছুই ঘটেনি, আয়েশার সাথে তার বিয়ে ছিল তখনকার সময়ের একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক বিয়ে। আরো একটি বিষয় হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিয়ের জন্য নিজের থেকে প্রস্তাব নিয়ে যাননি। আয়েশা রা.-এর সাথে এই বিয়ের প্রস্তাব আসে উম্মে শরিক খাওলা বিনতে হাকিম আস-সুলমিয়ার মাধ্যমে, যে বিয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আবু বকরের সাথে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক আরো দৃঢ় ও মজবুত হয়।

নির্ভরযোগ্য সিরাতের কিতাবে পাওয়া যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.-কে সর্বপ্রথম বিয়ের প্রস্তাব দেননি, তার আগেই জুবাইর বিন মুতয়িম বিন আদির পক্ষ থেকে তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে, তার জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসাই এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, তিনি শারীরিক ও মানসিক দিকে থেকে তার মধ্যে তখনই পরিপক্কতা এসেছিল।

এছাড়াও সে যুগে আয়েশা রাঃ ই কেবল সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ বালিকা নন যার পিতার বয়সী কারো সাথে বিয়ে হয়, বরং যেদিন আব্দুল মুত্তালিব বার্ধক্যে আমেনার চাচার মেয়ে হালাকে বিয়ে করেন, সেদিন তার সবচেয়ে ছোট ছেলে আব্দুল্লাহ হালার বয়সী একটি মেয়েকে বিয়ে করেন, তিনি হলেন আমেনা বিনতে ওয়াহাব। হজরত উমর রা. আলী বিন আব্দুল মুত্তালিবের মেয়েকে বিয়ে করেন, অথচ হিসেব করলে তিনি তখন তার দাদার বয়সী। অন্যদিকে উমর রা. তার তরুণী মেয়ে হাফসাকে বিয়ে করার জন্য আবু বকর রা. কাছে প্রস্তাব দেয়, অথচ তাদের মধ্যকার বয়সের পার্থক্য আর আয়েশা ও রাসূলের বয়সের পার্থক্য প্রায় একই।

যারা এই বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তারা চৌদ্দশ বছর পরে তৎকালীন ও বর্তমান যুগের কালগত ও অঞ্চলগত পার্থক্যকে ভুলে গিয়ে যুক্তি দাঁড় করায়। কোন ঘটনাকে তার সময় ও প্রতিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পর্যালোচনা করা গবেষণার একটি ভুল পদ্ধতি। কারণ, এ ঘটনা নিয়ে পর্যালোচনা করার সময় কারো ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, সামজিক কার্যকলাপ প্রথা ও রেওয়াজের মাধ্যমে প্রচণ্ড প্রভাবিত হয়, তাই এ যুগে কোন দেশের প্র্যাকটিস যদি আমাদের নিজ দেশের প্রথা রেওয়াজ ও সামাজিক মাপকাঠির বিরোধী হয় সেক্ষেত্রে আমাদেরও সেটার নিন্দা করা

উচিৎ না, কারণ প্রত্যেক যুগেই আলাদা প্রথা ও প্রবর্তন থাকে। তাই চৌদ্দশ বছর পূর্বের হিজরতের আগে মক্কায় সংগঠিত একটি বিয়েকে বর্তমানে পাশ্চাত্যের রীতিনীতির সাথে তুলনা করা একটি বড়ধরনের ভুল, কারণ বর্তমান সময়ে পশ্চিম রাষ্ট্রসমূহে পচিঁশ বছরের নিচে সাধারণত কোন মেয়ের বিয়েই হয় না।

এখানে এটি লক্ষণীয় যে, উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলসমূহে মেয়েরা অনেক দ্রুত সাবালকত্ব লাভ করে, সাধারণত সেটি আট বছর বয়সে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে শীতপ্রধান দেশগুলোতে মেয়েদের অনেকটা দেরিতে সাবালকত্ব লাভ হয়, সেটা অনেক সময় একুশ বছর বয়সেও হয়ে দাঁড়ায়।

তাই আয়েশা রা.-এর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে নিয়ে তাদের কোন আপত্তি তোলের অবকাশ নেই। এছাড়াও, এতে কেউ দ্বিমত করবে না যে, সে যুগে ও পরিবেশে মেয়েদের পরিপক্ক হিসেবে বিবেচনা কর হত শারীরিক বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে, দিন, মাস ও বছরের উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করা হত না।

একজন কৃষক যেমন তার ক্ষেতে ফসল পাকলে নিজে পরখ করে দেখে থাকে, তেমনি তখনকার সময় মানুষের শারীরিক বৃদ্ধি পরিপক্কতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হত। তৎকালীন পরিবেশে যেসমস্ত লক্ষণের বিবেচনায় একজন মেয়ে বিয়ের জন্য উপযুক্ত পরিগণিত হন, সেসব আলামতের উপর ভিত্তি করেই রাসূলের কাছে প্রস্তাব দেন খাওলা বিনতে হাকিম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার বিয়ের প্রস্তাব দেন।

তারা যেমনটি ধারণা করে থাকে যে, আয়েশা রা. তখন শিশু ছিলেন, আসলে তিনি সেরকম অল্প বয়স্কা শিশুর মত ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন পরিপক্ক ও ম্যাচুর্ড মেয়ে। তিনি তৎকালীন মক্কার বিয়েশাদির সামাজিক স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে একজন বিবাহযোগ্য পাত্রী ছিলেন।

দ্বিতীয়ত: আয়েশার সাথে রাসূলের বিয়ের পেছনে কিছু কারণ ও হিকমা

নবীজির সাথে আয়েশা রা.-এর বিয়ে আল্লাহর পক্ষে থেকে একটি নির্ধারিত ও নির্দেশিত বিষয় ছিল, তাই পরবর্তীতে আয়েশার বিয়ে দ্বীনী দাওয়াতের জন্য ঐতিহাসিকভাবে সবচেয়ে ফলপ্রসূ ও কার্যকর হিসেবে পরিগণিত হয়। তিনি রাসূলের কাছ থেকে বিশেষত নারীবিষয়ক মৌখিক ও কর্মগত সুন্নাহ ও শরয়ী বিধান প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করেছেন।

রাসূল স্বপ্নযোগে আয়েশা রা.-কে নিজের স্ত্রী হিসেবে দেখেন। এ হাদিসটি আয়েশা রা. নিজে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাকে স্বপ্নে তিন রাত আমাকে দেখানো হয়, জিবরিল আ: রেশমের একটি কাপড়ে করে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে আসেন। যখন মুখ থেকে কাপড় সরানো হয়, দেখলাম যে, সেখানে তুমি। আমি তখন বলি, যদি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। [৩]
অন্য বর্ণনায় আছে, স্বপ্ন দুইবার তোমাকে দেখানো হয়।[৪]

নবি-রাসূলের স্বপ্ন সত্য এবং আল্লাহ তা`আলার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। উসমান ইবনে মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকিম খাদিজা রা.-এর ইন্তেকালের দুইবছর পর আয়েশা ও সাওদা উভয়ের বিয়ের জন্য রাসূলের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যান। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পক্ষ থেকে তাঁকে প্রস্তাব দেওয়ার জন্য বলেন।

আবু সালামা ও ইয়াহিয়া থেকে [৫]বর্ণিত, তারা বলেন, খাদিজা রা: এর মৃত্যুর পর উসমান বিন মাজউনের স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকিম জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর রাসূল, আপনি কি বিয়ে করতে চান? তিনি তাকে প্রশ্ন

---

৩ *বুখারি:* ৩৬৮২

৪ *বুখারি:* ৬২৩৬

৫ *মুসনাদে আহমদ:* ২৫৮১০

করেন, কাকে? তখন খাওলা বলেন, কুমারী চাইলে কুমারী পাত্রী আছে, আবার বিবাহিতও আছে? তখন রাসূল আবার জিজ্ঞেস করেন, কুমারী কে? খাওলা বলেন, আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দার মেয়ে আয়েশা বিনতে আবু বকর। রাসূল বলেন, আর বিবাহিতা কে? খাওলা বলেন, সাওদা বিনতে যামআ,, আপনার উপর ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার প্রতিটি কথা তিনি অনুসরণ করেন। তখন রাসূল বলেন, আমার পক্ষ থেকে তাদের দুজনের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যাও। তখন খাওলা আবু বকরের বাড়ি গিয়ে ডাক দেন, হে উম্মে রুমান! জানো, আল্লাহ তা`আলা তোমাদের কী জন্য কল্যাণ ও বারাকার ফায়সালা করেছেন? উম্মে রুমান বলেন, না তো, কি সেই কল্যাণ ও বারাকা? খাওলা বলেন, রাসূল আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে আয়েশার জন্য প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। উম্মে রুমান বলেন, আবু বকর আসার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আবু বকর আসলে উম্মে রুমান বলেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা`আলা আপনাদের জন্য কী কল্যাণ ও বারাকার ফায়সালা করেছেন? তখন আবু বকর বলেন, কি সে কল্যাণ ও বারাকা? খাওলা বলেন, রাসূল আমাকে তার পক্ষ থেকে আয়েশার জন্য প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তখন আবু বকর বলেন, আয়েশা কি তাঁর উপযুক্ত? সে তো তাঁর ভাইয়ের মেয়ে। খাওলা তখন রাসূলের কাছে ফিরে যেয়ে সব কিছু খুলে বলেন। তখন রাসূল বলেন, তাঁর কাছে গিয়ে বল, আমি তার ভাই এবং সেও আমার দ্বীনী ভাই, তার মেয়ে আমার উপযুক্ত। আমি তখন গিয়ে রাসূলের কথাটি তাঁকে বললাম। তখন আবু বকর বললেন, একটু অপেক্ষা কর, তারপর তিনি বের হয়ে গেলেন। তখন উম্মে রুম্মান বললেন, মুতয়িম বিন আদি তার ছেলের জন্য আয়েশাকে প্রস্তাব দিয়েছিল। আল্লাহর কসম, সে আবু বকরের সাথে জীবনে কোন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করেনি। আবু বকর মুতয়িম বিন আদির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে গেলেন, তখন মুতয়িমের স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাকে দেখে বললেন, যদি তোমাদের সাথে সম্পর্ক করা হয়, তখন তো আমাদের ছেলেকে তুমি ধর্মে ত্যাগ করিয়ে তোমার ধর্মে প্রবেশ করাবে। আবু বকর মুতয়িম বিন আদিকে বলেন, তোমার স্ত্রী তো এ কথা বলে, এ কথা শুনে মুতয়িম বলে, সে তো ঠিক কথাই বলছে। একথা শুনে আবু বকর তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসেন। ওয়াদার জন্য তার মনে যে অস্বস্তি ছিল আল্লাহ

তা'আলা তা দূর করে দেন। ফিরে এসে খাওলাকে তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খবর পাঠাও, তিনি খবর পাঠান। আবু বকর তারপর নিজের মেয়েকে রাসূলের কাছে বিয়ে দেন, তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর।
নবুওয়াতের বারতম বছর শাওয়াল মাসে বিয়ের আকদ সম্পন্ন হয়। এতে কারো দ্বিমত নেই যে, আয়েশা রা. রাসূলের একমাত্র স্ত্রী ছিলেন যার বাবা-মা উভয়ই মুহাজির ছিলেন।

বদরের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাঃকে ঘরে তুলে আনেন। তাই শাওয়াল মাসে বিয়ে করা মুস্তাহাব। আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেন এবং আমার সাথে সংসার শুরু করেন শাওয়াল মাসে। রাসূলের কোন স্ত্রী আমার চেয়ে বেশি ভাগ্যবান?

আয়েশা রা.-এর বয়স তখন নয় বছর ছিল, তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মনের দিকে সর্বদা খেয়াল রাখতেন, তাঁকে সবসময় হাসিখুশি রাখার চেষ্টা করতেন। তিনি তাঁকে আনন্দ দেওয়ার জন্য মসজিদে নববির চত্বরে হাবশিদের বর্শাবল্লম নিয়ে কসরত করার আসর দেখার সুযোগ করে দিতেন। তার সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। আয়েশা রা. বলেন, রাসূল আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। আমি তাঁকে পেছনে ফেলে দেই। আমার স্বাস্থ্য কিছুটা বেড়ে গেলে তিনি আবার আমার সাথে প্রতিযোগিতা করেন, এবার তিনি আমাকে পিছনে ফেলে দেন। সেসময় তিনি বলেন, হে আয়েশা, এবারেরটা আগেরটার জবাব।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল, তোমাদের যে দাবি, তিনি তাঁর অধিকার হরণ করছেন। আচ্ছা, বলত, তিনি আয়েশার কোন অধিকার কোথায় কখন হরণ করেছেন?
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.-এর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্বামী ছিলেন। আয়েশা রাঃ কে তিনি বঁধুয়া বলে ডাকতেন।

একদিন মাথা ব্যথায় আয়েশার কষ্ট হচ্ছিল, তখন আয়েশা ব্যথায় বলে উঠেন, কী যে যন্ত্রণা মাথা ব্যথার! তখন রাসূল নিজের মাথা ব্যথার কথা প্রকাশ করে বলেন, আমারও প্রচণ্ড মাথা ব্যথা [তিনি নিজের মাথা ব্যথার কথা তাকে জানান নি, যাতে আয়েশা রা. পেরেশানিতে না পড়েন]।

আয়েশার প্রতি রাসূলের ভালোবাসার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, তিনি তাঁকে দেখাশুনা করার জন্য বেঁছে নিয়েছিলেন এবং তার কোলে ঢেলান দিয়ে ও গলা জড়িয়ে রাসূল ইন্তেকাল করেন। সাহাবায়ে কেরামও এ বিষয়টি জানতেন। তাই রাসূলের ভালোবাসার মানুষটিকে তাঁরাও ভালোবাসতেন এবং রাসূলকে খুশি করার জন্য আয়েশার ঘরে তাঁর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। আয়েশার প্রতি রাসূলের ভালোবাসার জন্য তাঁর নাম পড়ে যায়, আল্লাহর হাবিবের হাবিবাহ, আল্লাহর প্রিয়তমের প্রিয়তমা, আল্লাহর রাসূলের খালিলা, আল্লাহর রাসূলের হাবিবা।

সাহাবায়ে কেরামের এই অশেষ শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত ভালোবাসার দরুন আয়েশা রা. রাসূলের কাছে সম্মানের এক বিশেষ স্থান লাভ করেছিলেন, যার ফলে তিনি দ্বীনের অনেক বিষয় সম্পর্কে বিশেষত ইসলামি বিধান অনুসারে একজন স্বামীর সাথে স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের জন্য ইলমদ্বীনের জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত ছিলেন।

আল্লামা যুহরি বলেন, "যদি আমার কাছে আয়েশার জ্ঞান ও নবীর সকল স্ত্রীর জ্ঞান এবং নারীজাতির জ্ঞানকে একত্রে করে উপস্থিত করা হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস, শ্রেষ্ঠেত্বের বিচারে আয়েশার জ্ঞান এগিয়ে থাকবে।„

আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে আয়েশা রা.-এর সংসার পিতা আবু বকরের ঘরের সামাজিক মর্যাদাকে আরো উঁচু ও মহান করে তোলে, যেহেতু তিনি ছিলেন রাসূলের স্ত্রী ও মুমিনদের মাতা, আর যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন উম্মাহর প্রথম শিক্ষক, তাই তিনি ছিলেন রাসূলের সবচেয়ে কাছের

ছাত্রী। তাই কুরআনুল কারিম ও সুনানে নববীর জ্ঞান তাঁর এতটাই অর্জন হয়েছিল যে, জ্ঞানের বিশালতা ও বিস্তৃতির কারণে প্রথম কাতারের সাহাবিরা পর্যন্ত তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

পিতার ঘরের আয়েশি জীবন ও রাসূলের ঘরের সাদামাটা জীবনের মধ্যে বিস্তর তফাৎ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর নতুন জীবনকে জেনে বুঝে ধৈর্যের সাথে গ্রহণ করেনিয়েছিলেন। যেদিন রাসূল তাঁকে ইহকাল ও পরকালের জীবন এবং দুনিয়া ও ভোগবিলাসের জীবনের মধ্যে যে কোন একটা কে গ্রহণ করার কথা ভেবে দেখতে বলেছিলেন, সেদিন তিনি এক মুহূর্ত না ভেবে আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের জীবনকে বেঁছে নিয়েছিলেন।

তাঁর জীবন এতটাই বর্ণাঢ্য ছিল যে, সাড়া জীবন তিনি হাদিস, সুন্নাহ ও ফিকহে শাস্ত্রে মধ্যমণি ছিলেন। আবু মুসা আশয়ারি বলেন, "আমরা যে কোন বিষয়ে মুশকিলে পড়লে, তাঁর কাছে এ ব্যাপারে কোন না কোন দিকনির্দেশনা পেতাম।„
মূলত, আয়েশা রাঃ নিজের জ্ঞান ও যোগ্যতা এবং দুর্লভ গুণাবলি, যা সাধারণত তাঁর বয়সী মেয়েদের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর, সেসব গুণের বলেই সর্বশেষ নবি ও রাসূলের স্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। তাঁর মানসিক পরিপক্বতা, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার কল্যাণেই বিশ্ব ইতিহাসের মহামানব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

তৃতীয়ত: বহুগামিতার প্রতি কামনার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় যৌবনের প্রারম্ভ

তাদের দাবি অনুযায়ী, রাসূল যদি নারীর চিন্তাকামনাবাসনা সর্বস্ব একজন মানুষ হতেন, তাহলে সেই যৌবনেই তিনি একাধিক বিয়ে সেরে ফেলতেন, যেহেতু তখন কোন রিসালাতের দায়িত্ব ছিল না আর বার্ধক্যের কোন ক্লান্তি ও ক্লেশও ছিল না। কিন্তু আমরা যখন তাঁর অমর জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন লক্ষ্য করি, তিনি সেসময় সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার মোহ ও ভোগবিলাস থেকে বিরত ছিলেন, আর একটি দেখার ব্যাপার

হলো, তিনি তখন পঁচিশ বছর বয়সে চল্লিশ বছর বয়সী মহীয়সী খাদেজাকে বিয়ে করেন।

যদি নারীদের প্রতি তাঁর অসংযত ও অস্বাভাবিক কামনা থাকত, তাহলে তিনি শুধু খাদেজা রা.-এর সাথে দীর্ঘ এতটা দিন কাটিয়ে দিতেন না। যদি এ বিয়েকে আমরা কাকতালীয় ধরে নেই, তবুও আমাদের জিজ্ঞাসা, তাঁর মৃত্যুর পর তিনি কাকে বিয়ে করেন? তিনি খাদিজার পরে সাওদা বিনতে যামআ,কে বিয়ে করেন, তাঁর স্বামী মারা যাওয়ার পর তাঁর মনকষ্ট এবং নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য।
তিনি ছিলেন মধ্যবয়সী, এবং তাঁর এমন কোন অর্থরূপযৌবন ছিল না, যে অন্য কেউ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিবে। এই বিয়েই এ প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলের বিয়ের পেছনে শরয়ী ও মানবিক অনেকগুলো কারণ ছিল যা তারা বুঝেও না বুঝার ভান করে থাকে।

এছাড়াও যখন খাওলা বিনতে হাকিম রাসূলের কাছে আয়েশাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন, তখন তিনি চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি কি এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিবেন, আবু বকর রা.-এর দীর্ঘ আন্তরিক বন্ধুত্ব এবং রাসূলের কাছে তার অনন্য অবস্থান তাঁর চিন্তার মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। আয়েশা রা. যখন রাসূলের সংসারে আসেন তখন সাওদা বিনতে যামআ, তাঁকে অগ্রধিকার প্রদান করেন এবং আয়েশা রা. নিজের ব্যক্তিগত ইবাদত বন্দেগির সাথে সাথে রাসূলের ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তাঁর আরাম আয়েশ ও সুযোগসুবিধার যথাযথ যত্নশীল ছিলেন। এরপর সাড়াজীবন তিনি রাসূলের প্রতি ওয়াফাদার ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে ইলম আহরণ করে একজন জ্ঞানতাপসী হিসেবে নিজের জীবন কাটিয়ে দেন।

আয়েশা রা.-এর প্রতি ভালোবাসা ছিল মূলত আবু বকরের প্রতি রাসূলের ভালোবাসারই ভিন্ন প্রকাশ।রাসূলকে একবার জিজ্ঞাস করা হয়, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি কে? তিনি বলেন, আয়েশা, পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বলেন, আয়েশার পিতা। তিনি ছিলেন রাসূলের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী এবং সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। আয়েশাকে বিয়ে করার কারণ যতটা তাঁর সাথে সংসার করা এবং দাম্পত্য সুখশান্তি অর্জন করা তাঁর চেয়ে বেশি

ছিল আবু বকর রা.-কে সম্মান প্রদর্শন ও প্রাধান্য-নৈকট্য প্রদান করা এবং তাঁর মেয়েকে নববি ঘরে সবচেয়ে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা।

তাই কারো এ বিয়ে নিয়ে কথা তোলার কোন সুযোগ নেই, কারণ এ বিয়ে ছিল এমন এক সমাজে যেখানে মায়ের বয়সী কোন নারীকে বিয়ে করা যেমন দোষের কিছু ছিল না, তেমনি বাবার বয়সী কোন পুরুষকে বিয়ে করাও নিন্দার কিছু ছিল না।

তাই শুধু আয়েশাকে বিয়ে করার কারণে রাসূলকে কামুক বলা একটি বোধবিবেচনা শূন্য মিথ্যাচার। রাসূলের জন্য আরবের সবচেয়ে রূপসী মেয়েকে এমনকি রোম বা পারস্যের কোন মেয়েকে বিয়ে করা কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না এবং তাঁর জন্য এটাও কোন ব্যাপার ছিল না, নিজের ও পরিবারের জন্য তৎকালীন আরব নেতাদের মত আহার ও খাদ্যের বিশাল আয়োজন করা এবং দামি পোশাকপরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা।

তিনি কি তাঁর জীবনের শুরু দিকে এসব করেছিলেন না আরব আজম তাঁর কাছে নত হওয়ার পরে তিনি এমনটা করেছিলেন? তিনি তা কখনই করেননি, বরং তাঁর বিপরীতই তিনি করে গেছেন সাড়াজীবন। তিনি তো বাড়ির অন্নহীনতা ও দরিদ্রতার কারণে স্ত্রীদের অভিযোগ পর্যন্ত শুনতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং তাঁদের প্রায় হারাতেই বসেছিলেন।

সারসংক্ষেপ

- আয়েশা রা.-এর সাথে রাসূলের বিয়ে সে যুগ ও সমাজের বিবেচনায় একটি স্বাভাবিক ও নিত্যসাধারণ ব্যাপার ছিল। কুরাইশ গোত্রের কেউ এ বিয়ের কথা শুনে বিস্ময়বোধ করেনি। কুরাইশের নেতাদের মধ্যে অনেকেই নিজের সবচেয়ে ছোট ছেলের স্ত্রীর সমবয়সী মেয়েকেও বিয়ে করেছেন, যেমন রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিব।

❖ যদি এ বিয়ে দোষের কিছু হত, তাহলে কুরাইশেরা রাসূলের চরিত্র ও পবিত্রতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতো, অথচ এরকম কিছুই তখন ঘটেনি। এছাড়াও এ বিয়ের সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহ তা`আলার পক্ষে থেকে, রাসূল স্বপ্নযোগে জিবরিল আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যমে এ সিদ্ধান্ত জানেন। আর নবিরাসূলের স্বপ্ন সত্য। আর তিনি এই বিয়ের প্রস্তাব নিজ থেকে দেননি, খাওলা বিনতে হাকাম তিনিই এই বিয়ের প্রস্তাব দেন।

❖ উষ্ণমণ্ডলীয় দেশ ও অঞ্চলে মেয়েরা খুবই দ্রুত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, শীতলমণ্ডলে মেয়েরা খুবই দেরিতে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছে। উল্লেখ যে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও তৎকালিক সমকালকে পৃথক করে শুধু মাত্র ঘটনা বিশ্লেষণ করা একটি মারাত্মক পর্যায়ের ভ্রান্তি।

❖ এছাড়াও আয়েশা রা.-এর বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানগরিমা এতটাই উচ্চস্তরের ছিল যে তিনি সেই বয়সেই রাসূলের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিলেন। আর এতে উম্মাহের জন্য ছিল কল্যাণ ও বারাকা, যার ফলে তিনি রাসূলের শিক্ষা ও আদর্শ বিশেষত নারীসম্পর্কীয় বিষয়াদি প্রচুর বর্ণনা করেছিলেন।

❖ রাসূল আয়েশা রা.-এর জন্য সবচেয়ে আদর্শ স্বামী ছিলেন, তিনি তাঁকে যেমন মায়ামমতা স্নেহ দিয়েছেন, তেমনি প্রেমভালোবাসা ও সোহাগও দিয়েছেন।

দ্বাদশ ধারা : বিয়ের বয়স

[৬]এই [৭]ধারাতে উল্লেখ আছে যে, আঠার বছরের কম কোন ছেলে ও ষোল বছরের কম কোন মেয়ের বিয়ে আইনগতভাবে নিষিদ্ধ। সম্ভবত, এ ধারা প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো, কম বয়সে বিয়ে করার কারণে যে সমস্ত সমস্যা ও সংকট তৈরি হয় তা নিরসন করা, সমাজের সাথে যতদূর পর্যন্ত উক্ত উদ্দেশ্যের সঠিকতা ও কার্যকারিতার সম্পর্ক রয়েছে, ততদূর পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এটি স্বস্থানে ধর্তব্য ও স্বীকৃত একটি বিষয়। তবে আমরা সামনে বিশদভাবে এ বিষয়ে যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব তা থেকে আশা করি প্রতীয়মান হবে যে, সমস্যা থেকে উত্তরণের একমাত্র পন্থা এটি নয় যে, সকল প্রকার বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, কারণ, অধিকাংশ সময় মানুষ নিজের কম বয়সী ছেলেমেয়েকে বিবিধ কারণ ও পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তাৎক্ষণিক বিয়ে দিয়ে থাকে। এসব অবস্থা ও পরিস্থিতির প্রতি বিবেচনা করে শরিয়তে অল্প বয়সে বিয়ে করার বিষয়টি যেমন নিষিদ্ধ করা হয়নি, তেমনি এর প্রতি ঠিক উৎসাহিতও করা হয়নি।

কম বয়সে বিয়ের বৈধতা কুরআনের নিম্ন আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত—

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

তোমাদের নারীদের মধ্যে যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে (জেনে নাও যে,) তাদের ইদ্দতকাল তিন মাস। আর এখনো যাদের মাসিক আসা শুরু হয়নি, তাদের জন্যও একই নির্দেশ। [৬৫: ৪]

---

৬ মুফতি তাকি উসমানি দা. বা.-এর বিখ্যাত গ্রন্থ ھمارے عائلی مسائل থেকে সঙ্কলিত।

৭ হামারে আয়িলি মাসায়েল গ্রন্থে মুফতি তাকি উসমানি জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে প্রণীত মুসলিম পারিবারিক আইনের যেসমস্ত ধারা শরিয়াবিরোধী সেসমস্ত আইন কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে বিশদভাবে পর্যালোচনা করেন এবং তাঁর সমালোচনা করেন।

এই আয়াতে যে মেয়েরা এখন ঋতুমতী হয়নি, তাঁদের ইদ্দতের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লখ্য যে, ইদ্দতের প্রশ্ন তো তখনই আসে যখন কোন মেয়ের প্রথমে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয় বা সে তালাকপ্রাপ্তা হয়, সুতরাং এখান থেকে এটি বুঝা যায় যে, কুরআনুল কারিমের দৃষ্টিতে একটি মেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই বিয়ে করতে পারে। তাই শরিয়তের বিবেচনায় বাল্যবিবাহ গ্রহণযোগ্য। অথচ অধ্যাদেশের উল্লিখিত এই ধারায় কেবল বিবাহের জন্য উপযুক্ত হতে হলে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই কেবল চলবে না, বরং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার তিন থেকে চার বছরের পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয় বিয়ের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ার জন্য।

হাদিসে অল্প বয়সে বিয়ের ঘটনা

শরিয়তে যেহেতু বাল্যবিবাহ বৈধ, তাই নববি যুগে অল্পবয়সে বিয়ে সংঘটিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা আমরা হাদিস ও সিরাত গ্রন্থে পেয়ে থাকি,

১. রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আয়েশাকে বিয়ে করেন তখন তাঁর বয়স সবেমাত্র কোন কোন রেওয়াত মোতাবেক ছয় বছর, আর কোন কোন বর্ণনা অনুসারে সাত বছর ছিল, আর যখন তিনি তাঁর সংসারজীবনে প্রবেশ করেন তখন তাঁর নয় বছর বয়স ছিল।

২. আল্লামা আবু বকর জাসসাস আররাযি আহকামুল কুরআনে মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের সূত্রে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন— হজরত উম্মে সালামর ছেলে সালামাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক অল্প বয়সে হামযা রা.-এর ছোট মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন।

فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا

যখন রাসূল হামযা রা.-এর মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন তখন তাঁদের বয়স ছিল অনেক কম, তাঁরা একত্রে সংসার শুরু করার আগেই অল্প বয়সে দুজনই মারা যান।

ইজমায়ে উম্মাহ

এ সিদ্ধান্তের উপর আজ পর্যন্ত পুরো মুসলিম উম্মাহ একমত আছে যে, অল্প বয়সে বিয়ে করা বৈধ, এজন্য আল্লামা আবু বকর জাসসাস একটি আয়াতের অধীনে তিনি লিখেছেন— *"এই আয়াত থেকে এই বিষয়েরও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় যে, পিতার পক্ষে তাঁর অপ্রাপ্তঃবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে দেয়ার অধিকার আছে। কারণ, এই আয়াতে সকল অভিভাবকের জন্য বিয়ে দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হয়, আর যেহেতু পিতা সকল অভিভাবকের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্কের বিবেচনায় সবচেয়ে নিকটবর্তী, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবেই সর্বাগ্রেই এই অধিকার লাভ করে থাকবেন। আর এই মাসয়ালার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন ফকিহের দ্বিমত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।"*

এ বিধানের পিছনে ইসলামের অনস্বীকার্য হিকমা

আমরা সামনে কম বয়সে বিয়ের কারণ যে সংকট ও সমস্যা সৃষ্টি হয় তাঁর সঠিক সমাধান কী হতে পারে এ বিষয়ে তো আলোচনা করব, তবে এর আগে কম বয়সে বিয়ে আইনগত অবৈধ করার কারণে সমাজে যে ধরনের ক্ষতি ও অসুবিধা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া চেষ্টা করব। এই ক্ষতি ও অসুবিধাসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখলে আমাদের সহজেই বুঝে আসবে কেন ইসলামে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। যদি এই ধরনের বিয়েকে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহলে আমাদের সামাজিক জীবনে লক্ষ মানুষ এমন এমন সমস্যার মুখোমুখি হবে যে, যার কোন সমাধান আমাদের পক্ষে বের করা সম্ভব না, এ সমস্যাগুলোর স্বরূপ ও বাস্তবতা বোঝার জন্য আমরা কিছু উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করছি—

- এক ব্যক্তি দেখতে পাচ্ছে যে, তার ছেলে বা মেয়ের চরিত্র দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যদি দ্রুত তার বিয়ের ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে তাকে সামাল দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। এখন তার সামনে এই সমস্যা সমাধানের একটি উপযুক্ত পন্থাও উন্মুক্ত

আছে। এই পরিস্থিতিতে তাদের প্রতি কল্যাণ কামনার দাবি হলো, নিজ সন্তানদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে এখন আপনাদের আইনকানুনের কারণে নিরুপায়, যতদিন না তার ছেলের আঠার বছর হবে ততদিন সে তাকে বিয়ে দিতে পারবে না। সে নিজে তার সন্তানকে দিন দিন আরো বখে যেতে দেখবে, তবুও তার সমাধানের জন্য তার কিছু করার থাকবে না।

❖ এক ব্যক্তির রোগেব্যাধির কারণে আর বেশি দিন বাঁচার সম্ভাবনা নেই, তার একটি পনের বছরের মেয়ে আছে। তার হয়ত কোন ওয়ারিশ নেই, অথবা ওয়ারিশ আছে, তবে তার ব্যাপারে এ আশা করা যায় না, সে তার মেয়ের সাথে উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করবে এবং তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিবে। এ পরিস্থিতিতে তিনি চান যে, নিশ্চিন্তে দু,চোখ বন্ধ হওয়ার আগে তার মেয়েকে ভদ্র ও বিশ্বস্ত কোন ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে দিবে। কিন্তু সে আপনাদের আইনের কারণে নিরুপায়, তার মেয়েকে আপনাদের বানানো এই আইনের কারণে তাকে সে লাওয়ারিশ ও অসহায় অবস্থায় রেখে যাচ্ছে। দেখা যাবে পিতার ইন্তেকালের পর মেয়েটির তখন এক দরজা থেকে আরে দরজায় হোঁচট খেতে খেতে দিন যাচ্ছে, বা দুশ্চরিত্র লম্পট মানুষের লোভ ও লালসার শিকার হচ্ছে।

❖ একজন বিধবা নারীর কোন অভিভাবক বা উত্তরাধিকারী নেই, তার একটি বয়ঃপ্রাপ্ত বা অল্পবয়স্ক মেয়ে আছে। এ অসহায় ও অভিভাবকশূন্য নারীটির পক্ষে নিজের রুটিরুজির ব্যবস্থা করা এবং সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করাই স্বতন্ত্র একটি সমস্যা, এর উপর আরেকজন মানুষের ভরন পোষণের দায়িত্ব নেওয়া তো একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই এ মেয়েকে নিজের কাছে রাখা যেমনি অনিবার্যভাবে আর্থিক সমস্যার সৃষ্টি করে, তেমনি এ আশঙ্কাও আছে যে, যদি তার দ্রুত বিয়ের ব্যবস্থা না

করা হয়, তাহলে সে কোন বদমাশ লোকের খপ্পরে পড়তে পারে। এখন আপনিই বলুন, এই অসহায় নারীর নিজের মেয়েকে একজন ভালো মানুষের কাছে বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আছে? কিন্তু সে তা করতে পারবে না, কারণ আপনাদের আইন অনুযায়ী তার মেয়ে এখনও বিয়ের উপযুক্ত হয়নি।

❖ এক গ্রামের কৃষকের একটি যুবতি মেয়ে আছে, সে সবসময় লক্ষ্য করে যে, জমিদার ও অন্যান্য কৃষকেরা বদস্বভাব বশত মেয়েদেরকে নিজেদের যৌবিককামনার ফাঁদে ফেলে। তার এ আশঙ্কা হচ্ছে যে, যদি সে আর কিছুদিন তার মেয়েকে নিজের কাছে রাখে, তাহলে সে তার ইজ্জত আব্রুর যথাযথ হেফাজত করতে পারবে না। তাই সে এখন তাকে দ্রুত কোথাও বিয়ে দেওয়ার জন্য একরকম বাধ্য, কিন্তু সে যখন আপানদের প্রণীত আইনের দিকে তাকায়, তখন তার অক্ষমতা ও অপারগতার দরুন হাত গুটিয়ে বসে অশ্রুপাত করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। গ্রামাঞ্চল অধিক পরিমাণে বাল্যবিবাহের সবচেয়ে বড় কারণ হলো এটি। আর কৃষকশ্রেণির মানুষরা এভাবেই নিজেদের মানইজ্জতের হিফাজত করে থাকে। এটা তো আর কোন অজানা ও গোপন কোন তথ্য না যে, বর্গাচাষীদের ইজ্জত-আব্রু সবসময় জমির মালিকদের লাম্পট্যের কারণে ঝুঁকিতে থাকে। তাই এ পরিস্থিতিতে আপনাদের প্রণীত বিবাহসংক্রান্ত এই আইনের কারণে তিনি নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড অসহায় ও অক্ষম অনুভব করবেন।

❖ এই পরিস্থিতিগুলো নিছক অনুমান সর্বস্ব্য নয়, যা আমরা সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত না করেনিজ থেকে সৃষ্টি করেছি, বরং এই ঘটনাবহুল পৃথিবীতে চোখ রাখলে আপনি এমন অসংখ্য ও অগণিত মানুষকে দেখতে পাবেন, যাদের জন্য আপনাদের এ

আইন একটি জ্বলন্ত আযাবে পরিণত হয়েছে এবং তারা নিজেদেরকে ভীষণ অসহায় ও মজলুম মনে করছে।

❖ এসব সমস্যার অবধারিত ফলাফল এই যে, আমাদের জাতীর স্বভাব ও চরিত্রের অধঃপতন দিন দিন আর তীব্র হতে থাকবে, কিশোর অপরাধের মাত্রা এতটাই বেড়ে যাবে যে, ব্যক্তি পর্যায় ছাড়িয়ে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত এর ভয়াবহতা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে। ধর্ষণ ও ব্যাভিচারতার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে, ফলে সকলের কাছেই এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিয়ের উপর অমূলক ও অযৌক্তিক শর্ত ও আইন চাপিয়ে দিয়ে ব্যভিচারের পথ উম্মুক্ত ও সুগম করার পরিণতি কতটা ভয়াবহ।

❖ তাছাড়া এই আইনের কারণে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য `জন্ম তারিখ নথিভুক্তকরণ (Birth Registration) অপরিহার্য হয়ে পড়বে। আর এ বিষয়টি বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য একটি কঠিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, যার ফলে হয়তো নিজেদের বয়সকে বিবাহযোগ্য প্রমাণ করতে তারা মিথ্যা সাক্ষী আনতে বাধ্য হবে, নয়ত তাদের অন্য কোন অসৎ উপায় অবলম্বন করতে হবে।

❖ এছাড়াও এই আইনের কারণে বহু অসৎ ও ফেতনাবাজ লোকের বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ করার প্রবণতা বাড়বে, তাই শরিফ ও ভদ্রঘরের মানুষ চূড়ান্তভাবে বেইজ্জতি ও অপমানের শিকার হবে। মনে করুন, এক ব্যক্তির তার ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দিতে যাচ্ছে, এদিকে ওই এলাকার বিবাহ-রেজিস্ট্রেশনকারীর সাথে ঐ ব্যক্তির কোনো শত্রুতা আছে। সে

তখন ঐ পুরাতন শত্রতার জের ধরে ঠিক বিয়ের আগ মুহূর্তে বিয়ে ভণ্ডুল করে দেওয়ার জন্য এই আপত্তি তুলল যে, দেশের আইন অনুসারে ছেলে বা মেয়ের কারোরই এখনও বিয়ের করার উপযুক্ত বয়স হয়নি। এই আপত্তির কারণে সেই ব্যক্তি আগত অতিথিদেরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হবে, ফলে এ পর্যন্ত সে বিয়ে উপলক্ষ্যে যত টাকা খরচ করেছে, তা এক নিমেষে গচ্চা যাবে। তদুপরি সে যতক্ষণ পর্যন্ত মেডিকেল ইন্সপেকশন (Medical Inspection)- এর মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে না দিবে যে, আমার ছেলে বা মেয়ের বয়স বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে, ততক্ষন পর্যন্ত সে আর বিয়ে দিতে পারবে না। এসব কথাও নিছক কোনো অনুমান নির্ভর কথা নয়। পারিবারিক আইন কার্যকর হওয়ার মাত্র কিছু দিনের মধ্যেই পাঞ্জাব প্রদেশের কয়েকটি এলাকায় এজাতীয় ঘটনা ঘটার সংবাদ পাওয়া গেছে।

মোটকথা, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষনা করে দেয়ার পর উপরোক্ত এসব দুর্ঘটনা আজ হোক কাল ঘটবেই, যা পরিবর্তিতে রোধ করা মারাত্মক জটিল হয়ে দাঁড়াবে।

বাল্যবিবাহ সমস্যার সঠিক সমাধান

অবশ্য একথা ঠিক যে, কম বয়সে বিয়ে করার ব্যপারে ইসলাম কোথাও উৎসাহ প্রদান করেনি। কারণ, অনেক সময় এ জাতীয় বিয়ের ফলে বহু সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। শুধুমাত্র এতটুকু বিধান দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যদি কারও কম বয়সে বিয়ে করার বা করানোর প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহলে সে তা করেনিতে পারবে।

এখন এই অনুমতির কারণে যেসকল সমস্যা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, সেগুলো হলো, বয়স কম থাকার সময় এ অনুমান করা যায় না যে, স্বামী ও স্ত্রী স্বভাব-প্রকৃতির দিক থেকে একে অপরের সাথে মিলবে কিনা এবং পরবর্তীতে বয়স হলে দু,জনের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে

যাবে কিনা। এজন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কৈশোরে বিয়ে করিয়ে দেওয়ার পর দু.জনের মধ্যে বনিবনা হয় না। ফলে দু.জনের জন্যই জীবনটা একটা নরকে পরিণত হয়ে যায়। বিশেষ করে মেয়ে মানুষ তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বড়ই মুসিবতে পড়ে যায়। কারণ, ছেলেদের `তালাক. দানের এখতিয়ার থাকে, কিন্তু মেয়েদের তালাক প্রদানের এখতিয়ার নেই।

তাছাড়া বয়সে স্বল্প হওয়ার দরুন ছেলে জীবিকানির্বাহ করার উপযোগীও থাকে না। সুতরাং, সে কিভাবে আরেকজনের ভরনপোষণের দায়িত্ব নিবে? তাই বিয়ের পরেও সে নিজের স্ত্রীর যাবতীয় অধিকার আদায় করার ব্যাপারে একপ্রকার `নাদান. থাকে এবং এর ফলে বহু ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

এগুলোর মধ্যে প্রথম সমস্যা সমাধানকল্পে ইসলামি শরিয়ত خيار بلوغ (খিয়ারে বুলুগ)-এর বিধান দিয়েছে, যার অর্থ হলো, যখন ছেলে বা মেয়ে সাবালকত্ব অর্জন করবে, তখন তারা যদি শুধু মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয় যে, `আমি এ বিয়েতে সম্মত নই, তাহলেই বয়ঃপ্রাপ্তিপূর্ব সেই বিয়ের চুক্তি শরয়ী দৃষ্টিতে ছিন্ন হয়ে যাবে। এই বিধান সম্পর্কিত বিস্তারিত বর্ণনা ফিকাহের কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে।
আজকাল অল্প বয়সের বিয়েগুলো থেকে যেসকল অনিষ্টতা ও সমস্যা জন্ম নেয়, সেগুলোর বড় কারণ এই যে, জনগণ ইসলামি তালিম ও শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। তারা জানেই না যে, শরিয়ত তাদের জন্য কতটা সহজতা রেখেছে! জনগনকে যদি এসকল ইসলামি বিধিবিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা যায়, যার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে বার বার বলে আসছি, তাহলে এসব জটিলতার সমস্ত সমাধানই বেড়িয়ে আসবে।

এবারে দ্বিতীয় অনিষ্ঠতার বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক, কম বয়সে বিয়েটি যদি কোন প্রয়োজনের দিকে বিবেচনা করে করা হয়ে থাকে, তাহলে

ভরণপোষণ জাতীয় এ ধরনের সাময়িক সমস্যা অন্যসব সমস্যা ও সংকটের থেকে কয়েক গুণ ভাল, যা অবিবাহিত থাকার ফলে সৃষ্টি হয়। আর বিয়েটি যদি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই কোন ধরনের বিবেচনা না করে এমনিতেই দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে শরিয়তের পক্ষ থেকে বিয়ের অনুমোদন থাকাটাই এই দ্বিতীয় প্রকার সংকটসৃষ্টি হওয়ার প্রধান কারণ নয়, বরং মূল কারণ হলো, যিনি বিয়ে করবেন তার অজ্ঞতা ও বেওকুফি। তাই এর একমাত্র সমাধান হলো এই যে, সহিহ ইসলামি তা,লীম ও শিক্ষাব্যবস্থাকে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যেখানেই ইসলামের সহিহ তালিমের আলো গিয়ে পৌঁছেছে, সেখানেই অপ্রয়োজনীয় বাল্যবিয়ের হার হ্রাস পেতে পেতে গড়ে এক শতাংশও আর থাকে নি। নিজের দেশের প্রতিই লক্ষ্য করুন, শহর এবং যে সকল লোকালয় ইসলামি তালিমপ্রাপ্ত, সেখানে কম বয়সে বিয়ে করার প্রবনতা একেবারেই পাওয়া যায় না। এটা এজন্য হয়েছে যে, ইসলামি শিক্ষা ও তালিমের কারণে তারা একথা জানে যে, অপ্রয়োজনে কম বয়সে বিয়ে করলে সেটা হবে একটা আহাম্মকী কাজ, যার ফলাফল খুবই খারাপ হবে।

কম বয়সের বিয়ে-শাদীর ঘটনা বেশি পাওয়া যায় গ্রামাঞ্চলে এবং ইসলামি তালিমশূন্য লোকালয়ে। এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক মানুষেরই সত্যিকার অর্থে বিয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে। আর এদের অনেকই বিনা প্রয়োজনে একাজ করে ফেলছে। যদি এদের মাঝে সঠিক ইসলামি তালিম ছড়িয়ে দেয়া যায়, তাহলে তাদের এই আহাম্মকীপূর্ণ কাজের উপর জেদ ধরে থাকার কোনোই কারণ আর থাকবে না। এসব ছাড়াও আরও বহু অনিষ্টতা এমনও আছে, যা শুধুমাত্র দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে অজ্ঞতার কারণে জন্ম নেয়।

আইনের লাঠি ঘুরানোটাই সব কিছুর সমাধান নয়। বরং বহু ক্ষেত্রেই জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং সহিহ তালিম-তরবিয়তের পন্থা অবলম্বন করাটাই ফলপ্রসূ হয়ে থাকে, আলোচ্য বিষয়টিও এরকমই।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বাল্যবিবাহ কারণে যেসকল সমস্যা ও অনিষ্ঠতা জন্ম নেয়, তার থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হলো এ কাজকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষনা করে দেয়া নয়। কেননা, এর ফলে আরও বিবিধ সমস্যা ও বিপর্যয় সমাজের মধ্যে দেখা যাবে বরং এর সহিহ সমাধান হলো, ইসলামি সামাজিক শিক্ষাকে ব্যাপক আকার দান করা।

বিশেষ করে ইসলামের সহিহ ও বিশুদ্ধ পারিবারিক বিধিবিধানকে ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারপ্রসার করা, যাতে বাচ্চারা পর্যন্ত শরিয়ত প্রদত্ত এ সংক্রান্ত সহজতামূলক, বিষয়গুলোর জ্ঞান সহজেই অর্জন করতে পারে এবং তারা যেন এসব জ্ঞান পরবর্তীতে বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে পারে। কেউ যদি তার অজ্ঞতা ও আহম্মকির কারণে কোনো আইনের সহজতার দিকটিকে প্রয়োগ না করে, তাহলে সেই আইনটিই বাতিলযোগ্য অথবা সংশোধনযোগ্য হয়ে পড়ে না, বরং যে ব্যক্তি সহজতর পন্থা অবলম্বন করতে চায় না তাকেই বরং সংশোধনের আওতায় নিয়ে আসতে হয়।

আয়েশা রা.-এর সাথে অল্প বয়সে বিয়ের ব্যাপারটা সেসময়ের বিচারে মোটেই নতুন কোন বিষয় ছিল না, কারণ এ বয়সে মেয়েদের বিয়ে করা তৎকালীন সমাজের একটি সাধারণ প্রথা ও রেওয়াজ ছিল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও তৎকালিন সমকালকে পৃথক করে শুধু মাত্র ঘটনা বর্ণনা করা একটি মারাত্মক পর্যায়ের ভুল। এছাড়াও, আয়েশা রা. বিয়ের সময় শিশু ছিলেন না, বরং তিনি পূর্ণ সাবালিকা ছিলেন, কারণ, এর আগে তার জন্য যুবায়ের বিন মুতয়িম বিন আদির পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়।